কৃষি সংবাদ

আপনার নিজের জমির বীজ পরীক্ষা করিয়ে নিন

প্রত্যেক ফসল চাষ করার আগে আপনার নিজের রাখা বীজ পরীক্ষা করিয়ে নিন। আপনার এলাকার বীজ পরীক্ষাগারের সঙ্গে যোগাযোগ করে নমুনা সংগ্রহের নিয়মাবলী জেনে নিন। প্রতিটি নমুনা পরীক্ষা করানোর জন্য দেড় টাকা ফি লাগবে। তবে বি.ডি.ও বা এ.ই.ও মারফৎ বীজের নমুনা পাঠালে কোন ফি লাগবে না।

বীজ পরীক্ষাগারের ঠিকানা	কোন কোন জেলার জন্য
১। বীজ পরীক্ষণ সংস্থা ২৩৮, নেতাজী সুভাষ রোড, টালিগঞ্জ, কলিকাতা, ৪০	কলিকাতা, ২৪-পরগণা, নদীয়া, হাওড়া, হুগলী ও মেদিনীপুর।
২। আঞ্চলিক বীজ পরীক্ষণ কেন্দ্র জেলা কৃষি খামার, কালনা রোড, বর্ধমান।	বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া।
৩। আঞ্চলিক বীজ পরীক্ষণ কেন্দ্র গৌড় রোড, মালদহ।	মুর্শিদাবাদ, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও কোচবিহার।

একমাত্র ভাল বীজ থেকেই ভাল ফলন পাওয়া যায়

পশ্চিমবঙ্গ কৃষি তথ্য সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত

অযথা
বিপদ-শৃঙ্খল
টানবেন না
অন্যদেরও
টানতে
দেবেন না
অপরিহার্য না হ'লে তুচ্ছ কারণে
কখনই বিপদ-শৃঙ্খল টানবেন না-
এতে নিয়মিত ট্রেন-চলাচল
বিপর্যস্ত হয়।
পূর্ব রেলওয়ে

উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের লক্ষ্যে...
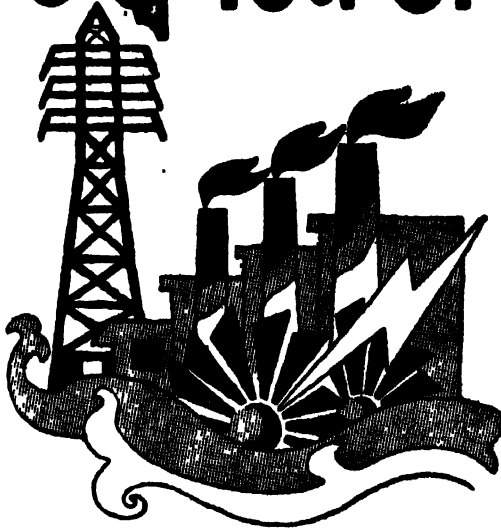
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ এই রাজ্যে কৃষি, শিল্প, রেলচলাচল, গার্হস্থ্য ও বাণিজ্যিক প্রয়োজনে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে। এছাড়া, কলকাতার চাহিদা পূরণেও পর্ষৎ বিদ্যুৎ সরবরাহ করে থাকে। ১৯৭৩ এবং ১৯৭৪ সালে কলকাতার বিদ্যুৎ সংকটের মোকাবিলায় ব্যাণ্ডেল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের চারটি ইউনিটকেই বছরের অর্ধেক সময় অবিরাম চালু রাখতে হয়েছিল। সাঁওতালডি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকেও ইতিমধ্যে কলকাতায় সরবরাহের জন্যে ডিভিসি-র মাধ্যমে বিদ্যুৎ আসতে শুরু করেছে। উত্তরবঙ্গে জলঢাকা কেন্দ্র নির্ভরযোগ্যভাবে বিদ্যুৎ যোগান দিয়ে চলেছে।

প্রকল্প : ব্যাণ্ডেল ও সাঁওতালডি—এ দুটি কেন্দ্র বর্তমানে সম্প্রসারিত হচ্ছে। আগামী কিছুদিনের মধ্যেই সাঁওতালডির দ্বিতীয় ইউনিট নতুন ২২০ কেভি লাইনের মাধ্যমে কলকাতায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে শুরু করবে। এছাড়া কোলাঘাটে তিনটি ২০০ মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন ইউনিট স্থাপনের কাজও হাতে নেওয়া হয়েছে। জলঢাকা ও কার্শিয়াঙের জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র দুটির বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর কাজও এগিয়ে চলেছে।

গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ : ইতিমধ্যেই রাজ্যের প্রায় ১০,০০০টি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে। মাত্র আড়াই বছরের মধ্যেই রাজ্যের ৭০০০ গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।
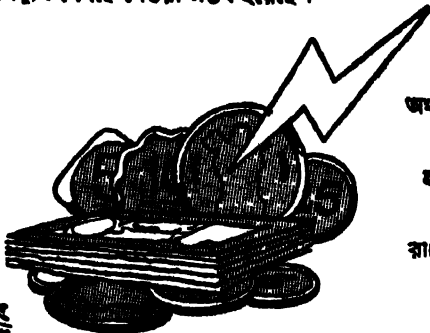
অর্থ : এই বিশাল কর্মকাণ্ডের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ জোগাড়ের জন্যে পর্ষৎ আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রতিককালে জ্বালানী, মাশুল এবং অন্যান্য খাতে বর্ধিত ব্যয় সামাল দিতে বিদ্যুতের হার সংশোধন করা হয়েছে। বিভিন্ন অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান থেকে যদি ঠিকমতো অর্থ যথাসময়ে পাওয়া যায়, তাহলে ৫ম পরিকল্পনার শেষে রাজ্যে ১০০০ মেগাওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে যেসব প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে, সেগুলির কাজ সময়মতো শেষ করা সম্ভব হবে।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের
লক্ষ্য পূরণে

ইউবিআই-এর
রেকারিং ডিপজিট স্কীমে

প্রয়োজনের সঙ্গে
তাল রেখে সঞ্চয়ও বেড়ে ওঠে

কখনো না কখনো নিশ্চয়ই আপনার একসঙ্গে থোক টাকার দরকার পড়ে।
আমাদের রেকারিং ডিপজিট স্কীমে আপনার পরিকল্পনামত সঞ্চয়ের সুবিধে আছে। পাঁচ থেকে পাঁচশ টাকার মধ্যে সাধ্যমত একটা নির্দিষ্ট টাকা মাসে মাসে জমাতে শুরু করুন! আপনার পক্ষে সুবিধেজনক মেয়াদ আপনিই ঠিক করবেন। দেখুন না, আপনার সঞ্চয় চক্রবৃদ্ধি সুদে কেমন বেড়ে ওঠে!

জমবার যে টাকা থাকে না, সত্যিকার কাজেও লাগে না, সেটাই নিয়মিত জমালে আপনি একসময় মোটা টাকা পাবেন। ধরুন, ৭২ মাসের মেয়াদে প্রতি মাসে আপনি ১০ টাকা করে রেখেছেন। মেয়াদ শেষে আপনার তাহলে জমলো ৭২০ টাকা। কিন্তু ইউবিআই আপনাকে দেবে ৯৮৩ টাকা। আজই ইউবিআই-তে একটা রেকারিং ডিপজিট অ্যাকাউণ্ট খুলুন।

মাসিক কিস্তি	মেয়াদ শেষে আপনি পাবেন					
	১২ মাস	২৪ মাস	৩৬ মাস	৪৮ মাস	৬০ মাস	৭২ মাস
টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
৫	৬৩	১৩০	২০৭	২৮৯	৩৭৮	৪৯১
১০	১২৫	২৬১	৪১৪	৫৭৮	৭৫৭	৯৮৩
২০	২৫১	৫২১	৮২৭	১১৫৫	১৫১৩	১৯৬৬
৩০	৩৭৬	৭৮২	১২৪১	১৭৩৩	২২৭০	২৯৪৯
৪০	৫০১	১০৪৩	১৬৫৪	২৩১০	৩০২৭	৩৯৩২

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

naa-UBI-7427

A crisis isn't a crisis when there's C. Tech.
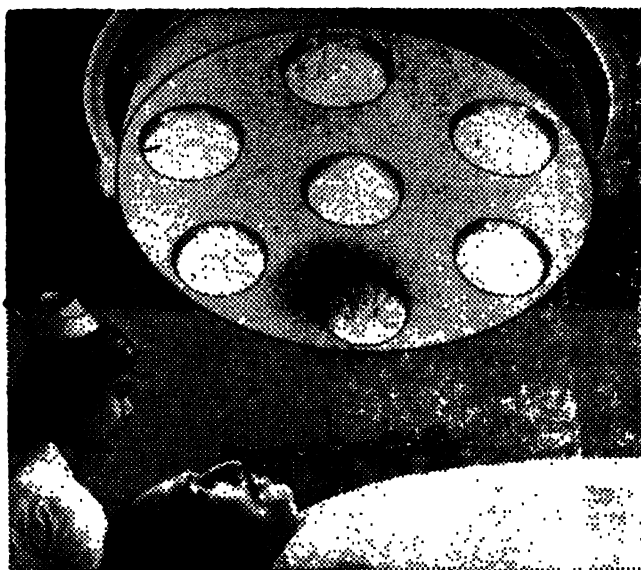
C. Tech. stands for Chloride Technology.

When power suddenly fails during surgery, it is C. Tech. that puts power on again—instantly !

Now imagine a scene like this :

Patient on the operating table. Two surgeons, five nurses, anaesthetists, two o.t. assistants. Ten people trying to save the life of one man.

Plus a host of lights, electronic equipment to monitor heart-beats, feed oxygenated blood—all needing a steady feed of power—and then suddenly—the power fails.

C. Tech. goes into action. In split seconds, Chloride's stand-by power batteries take over and continue—so fast, the surgeons don't even notice !

Today, Chloride's range of emergency storage batteries for stand-by power is working in hospitals and nursing homes across the country—saving and preserving lives whenever a crisis arises.

And wherever you find our product, you will find that Chloride Technology has resulted in peak efficiency and performance.

At a crucial period in our nation's growth, involvement is a nice feeling indeed.

CHLORIDE *Chloride Technology makes us more involved than you think!*

CC-39

একজন বাবু বগি করিয়া যাইতেছিলেন, তাঁহার বাটী কলিকাতা হইতে কিছু দূর। গাড়িখানি মন্থর গতিতে অতি ধীরে ধীরে যাইতেছে। ঘোড়াটি টেঁকচাঁদ ঠাকুরের পক্ষীরাজ বংশ। বেতো ঘোড়ার বাবা। সপাসপ্ চাবুক পড়িলেও চাল বিগড়ায় না। বাবু পথিমধ্যে নিজ গ্রামস্থ কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া কহিলেন, 'শিরোমনি মহাশয়! আমার গাড়িতে আসুন'। তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, 'বাবু! আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, শীঘ্র বাটী যাইতে হইবে'।

(রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল একাল' থেকে)

কলকাতা/রাজনারায়ণের কলমে

রাজনারায়ণ বসুর কলমে যে-কলকাতার ছবি, সেটা গত শতকের গোড়ার। কিন্তু আজকের এই দ্রুতগামিতার যুগেও কলকাতার বহুমানুষের মনের কথাটা যেন সেকালের শিরোমনি মশায়ের মতই। শীঘ্র বাটী যাইতে হইবে, অতএব হাঁটাই শ্রেয়। এই মনোভাবের কারণ কি? কারণ একটাই। যানবাহনের গতিহীনতা। কলকাতা শহরে জনতা বেড়েছে। জনপদ বেড়েছে। জনপথ বাড়ে নি। বাড়ন্ত জনসংখ্যার তুলনায় পথ-ঘাট সংকীর্ণ। তাই প্রতি মুহূর্তেই যানবাহনের গতি মন্থর দ্রুতগামী যানও যেন বেতো ঘোড়ার বাবা।

এই সংকটের একমাত্র সমাধান ভূগর্ভ রেল তারই প্রস্তুতিপর্ব চলছে। কলকাতার মানুষ এগিয়ে দিয়েছে সহযোগিতার হাত। আমরা এগিয়ে দিয়েছি শ্রমের মুঠি এই দুয়ের যোগফলে গড়ে উঠবে নতুন কলকাতা। গতি এবং প্রগতির।

কলকাতার নতুন মানচিত্র রচনায় ভূগর্ভ-রেল

মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (রেলওয়েজ)

বর্ষ ৩৬ কার্তিক-পৌষ ১৩৮১

সূচিপত্র

সম্পাদক : বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য

আতাউর রহমান কর্তৃক নাভানা প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ১৩ থেকে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা, ১৩ থেকে প্রকাশিত।

বর্ষ ৩৬ কার্তিক-পৌষ ১৩৮১

কবিতা নিয়ে ভাবনা

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

চারদিকে তাকিয়ে মাঝে-মাঝে খুব ভাবনায় পড়ে যাই। খুব অস্বস্তি বোধ করি। অস্বস্তি আমার একার নয়, অনেকেরই। আমরা কেউই বিশেষ স্বস্তির মধ্যে নেই, অথচ সেই স্বস্তিহীনতার কথাটাকে স্পষ্ট করে উচ্চারণ করতেও আমাদের দারুণ অস্বস্তি। আমরা প্রত্যেকেই ভাবছি যে, অনেক তো দৌড়ঝাঁপ হল, এইবারে কোথাও একটু বসতে পারলে ভাল হত। কোনও গাছের তলায় না হোক, কোনও গাড়িবারান্দার নীচে, কোনও নদীর ধারে না হোক, কোনও জনবিরল সরাইখানার স্তব্ধতায়। শরীর ক্লান্ত, মন বিশ্রাম চাইছে, চোখ দুটিও দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে, বর্ণ থেকে অন্য বর্ণে অবিশ্রান্ত ধাবিত হতে অনিচ্ছুক,—তারাও এখন, অন্তত খানিকক্ষণের জন্যে, একই দৃশ্যে নিবিষ্ট থাকতে চায়।

অথচ সেই বিরতির ব্যবস্থা আমরা রাখিনি। মাঝে-মাঝেই একটা অদ্ভুত রকমের তুলনা আমাদের মাথায় আসে। অদ্ভুত, তবু একেবারে অবাস্তব নয়। মনে হয়, যেন একটা ট্রেনের কামরায় আমরা বসে আছি, ভীষণ জোরে ছুটছে সেই ট্রেন, ছুটেই চলেছে, দুপাশের বাড়িঘর, গাছপালা, টেলিগ্রাফের খুঁটি, তারের উপরে মাছরাঙা, খেলার মাঠ আর খেত-খামারও সেইসঙ্গে উল্টো দিকে দৌড়চ্ছে, এই এখুনি যেটা আমাদের চোখের সামনে, পরক্ষণেই সেটা পিছনে অন্ধকারে হারিয়ে গেল, অনেকক্ষণ পরে-পরে আসছে এক-একটা স্টেশন, কিন্তু তারাও তাদের প্ল্যাটফর্ম, জলের কল, কলের পাশে কৃষ্ণচূড়া, ডালভর্তি লাল ফুল, টিকিট-কাউনটার, মানুষজন ইত্যাদিকে এক-লহমার বেশী দৃশ্যমান রাখছে না, যেন সেই সবকিছু সমেত মানুষী পরিশ্রমের এক-একটা চমৎকার বিন্যাস মাত্রই এক মুহূর্তের জন্যে ভুস করে আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠছে, তারপরেই ঝাঁপ দিচ্ছে উল্টো-দিকে,—চোখের অন্তরালে হারিয়ে যাচ্ছে।

দৃশ্যগুলি দ্রুত ছুটছে; বিশ্ব জুড়ে দ্রুত ঘটছে অসংখ্য রকমের ঘটনা। সে-সব ঘটনার কোনওটিরই গুরুত্ব কম নয়; অথচ বড্ড বেশী দ্রুত ঘটছে বলেই যেন তার গুরুত্ব, তার তাৎপর্য আমরা ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারছি না। ঘটনার পর ঘটনা, চমকের পর চমক; ঘরে বাইরে,

প্রাচ্যে প্রতীচীতে—সর্বত্র। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগের দিনগুলিকে মনে পড়ে। খুব বেশী দিন আগেকার কথা তো নয়; অথচ তখনও, আজকের তুলনায়, ঘটনাস্রোতের গতি ছিল অনেক মন্থর, জগৎ যেন তখনও খুব আস্তে-সুস্থে, বিন্দুমাত্র ব্যস্ত না-হয়ে এগোচ্ছিল। বড় রকমের কোনও ব্যাপার ঘটলে তক্ষুনি সে-বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছবার দরকার হত না, নানান দিক থেকে তাকে বিচার করবার, তার উপরে আলো ফেলবার, তার অন্ধকার দিকগুলিকে যতটা সম্ভব স্পষ্ট করে তুলবার, ব্যাপারটা ভাল কি মন্দ ভেবে দেখবার সময় পাওয়া যেত। এখন যায় না। এখন খুব তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত করতে হয়, নইলে হয়ত আদৌ কোনও সিদ্ধান্তই করা যাবে না, তার আগেই নতুন কিছু ঘটে যাবে, এবং সেই নতুন ঘটনার গুরুত্ব হয়ত আরও বেশী, ফলত সে-ই হয়ত তখন আমাদের সমস্ত আগ্রহ দাবি করে বসবে, পিছনের অন্ধকারে হারিয়ে যাবে আগের মুহূর্তের ঘটনা, তার সমস্ত তাৎপর্য। ব্যাপার দেখে মনে হয় যেন নিষ্ঠুর, অস্থির, অবিবেকী, অসহিষ্ণু কোনও পরীক্ষকের সামনে আমরা পরীক্ষা দিতে বসেছি, তিনি প্রশ্ন করছেন, কিন্তু ভেবেচিন্তে উত্তর দেবার জন্য যতটা সময় চাই, তা কিছুতেই বরাদ্দ করছেন না, আমরা মুখ খুলবার আগেই ছুঁড়ে দিচ্ছেন তাঁর পরবর্তী প্রশ্ন। কিংবা, আমরা কলম খুলবার আগেই, কেড়ে নিচ্ছেন আমাদের খাতা।

ফরাসী বিপ্লবের পটভূমিকায় লেখা তাঁর উপন্যাসের একেবারে সূচনাতেই—সময়টা তখন কেমন যাচ্ছিল তার আভাস দিতে গিয়ে—ডিকেন্স বলেছিলেন, অমন সুসময় আর কখনও আসেনি, এবং অমন দুঃসময়ও না। কথাটা, সম্ভবত, আজকের এই সময় সম্পর্কে আরও বেশী খাটে। একই সঙ্গে এমন পূর্ণিমা আর অমাবস্যা সম্ভবত মানুষের ইতিহাসে এর আগে আর কখনও দেখা যায়নি। বিজ্ঞানের যে অগ্রগতি একালে ঘটেছে, ইতিপূর্বে তা বস্তুত কল্পনার অতীত ছিল। কিংবা আমি হয়ত ভুল বললুম। কল্পনাশ্রয়ী বিজ্ঞান-সাহিত্য, যা কিনা ভবিষ্যতের ছবি এঁকে দেখায়, তো নেহাত আজকের ব্যাপার নয়, অনেককাল ধরেই লেখা হচ্ছে। এবং তার লেখকদের বল্গাবিহীন কল্পনা যে অনেক ক্ষেত্রে বাস্তবের সঙ্গে, পুরোটা না হোক, চোদ্দ-আনা মিলেও গিয়েছে, তাও স্বীকার্য। জুলে ভার্ন সেই কবে কী স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেটাও কেমন ফলে গেল। কিন্তু প্রশ্ন, স্বপ্ন যে এমনভাবে ফলবে, স্বয়ং স্বপ্নদ্রষ্টাও কি তা ভাবতে পেরেছিলেন? যাক গে, যেটা আসল কথা, সেটা এই যে, এমন অসংখ্য উপায় একালে মর্ত্য-মানবের মুঠোর মধ্যে এসে গিয়েছে, যার দ্বারা এই মানবসমাজের অশেষ কল্যাণ করা যায়। আবার সেই একই উপায় যে অশেষ অকল্যাণের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে, তাও ঠিক। জীবতাত্ত্বিক ডেসমন্ড মরিস বড় দুঃখের সঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন যে, মানুষ যেন বড্ড-তাড়াতাড়ি বড্ড-বেশী উন্নতি করে ফেলেছে, ফলে সে তার উন্নতির তাল সামলাতে পারছে না। সে একরকম-ভাবে তার জীবনটাকে সাজিয়ে নিতে-না-নিতেই দেখা দিচ্ছে আর-একরকমভাবে জীবনযাপনের প্রয়োজন। সে একরকমের একটা বিন্যাসকে দাঁড় করাতে-না-করাতেই সেটাকে ভেঙে ফেলে আর-একরকমের বিন্যাসকে খাড়া করবার দরকার ঘটে যাচ্ছে। ফলে, যাবতীয় উন্নতি সত্ত্বেও, তার স্থিতি হচ্ছে না, তার অগ্রগতি হয়ে দাঁড়াচ্ছে যেমন বেতালা, তেমনি বিশৃঙ্খল। মরিস মিথ্যে বলেননি। ভাবতে অবাক লাগে যে, (সর্দি-জ্বর বা ইনফ্লুয়েনজার মতো সামান্য ব্যাধিরও কোনও মোক্ষম দাওয়াই অদ্যাপি যদিও উদ্‌ভাবিত হয়নি, তবু) মানুষেরই গড়া উপগ্রহ আজ মহাকাশে টহল

দিয়ে ফেরে, এবং মাটির মানুষ আজ চাঁদের পিঠে হেঁটে বেড়ায়। কিন্তু একই সঙ্গে আমরা জেনে গিয়েছি যে, মানবতার ভবিষ্যৎ আর কখনও ঠিক এতটাই অনিশ্চিত ছিল না। মানুষ কি আর-কখনও এত দ্বিধায়-সংশয়ে কেঁপেছে? মৃত্যুর ছায়া কি আর-কখনও তার জীবনকে এত অন্ধকার করে রেখেছে? সভ্যতার, মনুষ্যত্বের এক সার্বিক বিনষ্টির আশঙ্কা কি আর-কখনও মানবসমাজকে এতটা অস্থির করেছিল?

বলা বাহুল্য, অনিশ্চয়তার ব্যাধি সর্বযুগেই ছিল। কিন্তু সর্বমানুষের জীবনে তা আর-কখনও আজকের মতো এত ব্যাপকভাবে দেখা দেয়নি। একদিকে যখন রাজ্যপাটের ভাঙাগড়া চলত, অন্যদিকে চাষী তখন নিত্যকার মতোই, নিশ্চিন্ত না হোক, নির্বিকার চিত্তে মাঠে লাঙল দিতে পেরেছে, বীজ বুনতে পেরেছে, ফসল কাটতে পেরেছে। একালে পারে না। পৃথিবীর এক ব্যাপক অংশ জুড়েই পারে না। অনিশ্চয়তার ব্যাধি আর এখন স্থানবিশেষে সীমাবদ্ধ নয়; নানাস্থানে তা ছড়িয়ে গিয়েছে। এখনও যাচ্ছে। বিস্মিত একটি বিপন্নতার বোধ একালের মানুষের জীবনকে ক্রমে ক্রমে অধিকার করে নিচ্ছে।

অবস্থাটা যে একটু গুছিয়ে, একটু স্থির হয়ে কোথাও বসবার পক্ষে আদৌ অনুকূল নয়, সে-কথা আমরা প্রত্যেকেই বুঝতে পারছি। তার জন্যে প্রত্যেকেই আমরা অস্বস্তি বোধ করছি। শিল্পীরা, সাহিত্যিকরা আরও, কেননা এমনিতে যদিও ভীষণ রকমের জ্বালা তাঁদের মাথার মধ্যে, দারুণ রকমের অস্থিরতা তাঁদের মনে, তবু, অন্তত সৃষ্টির প্রয়োজনে, স্থির হয়ে তাঁদের বসতেই হয়; অন্তত তখন, অর্থাৎ যখন তাঁরা হাতে তুলি নিয়ে ইজেলের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, কিংবা কলম নিয়ে টেবিলে নিবিষ্ট, অন্তত তখন—সৃষ্টির সেই মুহূর্তে—অস্থির হলে তাঁদের চলে না।

ধরা যাক, প্রেক্ষাগারে তাঁরা বসে আছেন, চোখের সামনে—পর্দার উপরে—দ্রুত-অপস্রিয়মাণ দৃশ্যের মিছিল, সেই অবস্থাতেই অন্যের অগোচরে, সহস্রজনের মধ্য থেকে, নিঃশব্দে একসময় তাঁদের বেরিয়ে আসতে হয়, নিজের ঘরে ফিরে এসে প্রত্যেককেই বসতে হয় তাঁর নিজের আসনে; এখন—অন্তত কিছুক্ষণের জন্য—তিনি দ্রষ্টা নন, স্রষ্টা; যেটুকু দেখেছেন, শান্ত হয়ে মগ্ন হয়ে সেইটুকুর কথাই তিনি এখন লিখবেন, নিজের চিত্তে প্রতিফলিত করে তাকে আবার নতুন করে নির্মাণ করবেন।

কিন্তু, হায়, কী তিনি দেখেছেন? যা দেখেছেন, তাকে ভাল করে দেখবার মতো সময় তিনি পেয়েছিলেন কি? কতক্ষণ সেই দৃশ্য তাঁর চোখের সামনে ছিল? তার চেয়েও বড় কথা, যা-কিছুই আমরা দেখি, তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলে না, সবকিছুকেই তার পারিপার্শ্বিকের মধ্যে স্থাপন করে দেখতে হয়, নতুন করে আবার যখন তাকে রচনা করব, তখন সেই পরিমণ্ডলকেও রচনা করা চাই, তার মধ্যে স্থাপন করে তাকে দেখানো চাই, নইলে তার তাৎপর্য কিছুতেই স্পষ্ট হবে না, সে প্রাণ পাবে না। সুতরাং প্রশ্ন, ধাবমান দৃশ্যপটে যে-বৃক্ষ কিংবা পাখি কিংবা মানুষটিকে কোন শিল্পী কিংবা সাহিত্যিক দেখেছিলেন, তার অনুষঙ্গও তাঁর চোখে পড়েছিল তো? শুধু বৃক্ষটিকে দেখলেই কাজ ফুরোচ্ছে না, ঝামেলা মিটছে না, তার পাশের নদী কিংবা পুকুরটিকেও দেখতে হয়; উড়ন্ত পাখির সঙ্গে দেখতে হয় তার আকাশ, কিংবা তার দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি নিষাদকে; শুধু কৃষকটিকে নয়, তার চারপাশের শস্যের ঐশ্বর্য কিংবা শস্যহীন মাঠের রিক্ততাও দেখে নেওয়া চাই। আঁকবার কিংবা

লিখবার সময়ে সেই অনুষঙ্গের মধ্যে তাকে স্থাপন করতে হবে, পারিপার্শ্বের সঙ্গে যুক্ত করে তাকে দেখাতে হবে। কিন্তু তেমন করে তিনি কি তাকে দেখেছিলেন?

সুযোগ ছিল না। সময় ছিল না। না একটু নিবিষ্ট হয়ে দেখবার, না একটু মগ্ন হয়ে আঁকবার অথবা লিখবার। অন্য বিষয়ের কথা অন্যেরা জানেন, আমার ভাবনা কবিতা নিয়ে। একালের কবিতা—শুধু এ-দেশের নয়, অন্যান্য দেশেরও সাম্প্রতিক কবিতা—পড়তে-পড়তে অনেক সময়েই আমার মনে হয়, ইতস্তত যেন-বা অনেক ফাঁক রয়ে গেল, ছবিটা ঠিক সম্পূর্ণ হল না, এক-পলকে-দেখা নিসর্গ কিংবা মানুষকে তাতে কোনোক্রমে চিত্রিত করা হয়েছে, যেন দেখা এবং লেখা, এই দুটি কাজই অতি দ্রুত সমাধা হয়েছিল, যেন যে-বিষয়ে যিনি লিখেছেন, তাকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করবার মতো সময় কিংবা সুযোগ তাঁর ছিল না; এবং লেখার মধ্যে যখন আবার নতুন করে তাকে নির্মাণ করেছেন, তখনও তিনি যতটা দরকার ঠিক ততটাই সময় কিংবা একাগ্র আগ্রহ তাকে দিতে পারেননি।

দোষ সর্বদা কবির নয়, সর্বাংশে তো নয়ই। মগ্ন হয়ে কিছু লিখবার আগে মগ্ন হয়ে কিছু দেখা চাই, কিন্তু তেমন করে দেখতে তাঁকে দিচ্ছে কে? সবই তো এখন ঝলক-দর্শনের ব্যাপার। ঘটনার পিঠে ঘটনা যখন হুমড়ি খেয়ে পড়ছে, রাস্তার দু-দিকেই দৃশ্যপট যখন দ্রুত-অপস্রিয়মাণ, তখন কোনও-কিছুই তো তার যাবতীয় অনুষঙ্গ নিয়ে, সমগ্রভাবে স্পষ্টভাবে তাঁর চোখের সামনে ফুটছে না। তিনি খণ্ড-খণ্ড ছবিই শুধু দেখে যাচ্ছেন,—টুকরো-টুকরো মানুষ, টুকরো-টুকরো ভাবনা; তাঁর লেখার মধ্যেই বা কী করে তবে সমগ্রতার চিত্র আমরা দাবি করব?

অথচ আমরা জানি যে, যতক্ষণ না সানুষঙ্গ, সম্পূর্ণ হয়ে দেখা দিচ্ছে, কোনওকিছুই ততক্ষণ বিশ্বাসযোগ্য হয় না, সাহিত্যের সত্য হয়ে ওঠে না। কবিতা নিয়ে কতজনেই তো কত মামুলী অভিযোগ তোলেন, খুব সহজেই সে-সব অভিযোগের উত্তর দিয়ে দেওয়া যায়। কিছুকাল আগে অভিযোগ উঠেছিল, একালের কবিরা নাকি জীবনের উলটো-দিকে চোখ ফিরিয়ে বসে আছেন। তার উত্তরে বলা যায় যে, সেই উলটো-দিকটাও জীবনেরই এলাকার মধ্যে পড়ে। অভিযোগ উঠতে দেখি কবিতার শারীরিক নির্মিতি নিয়েও। কিন্তু, এ-কালের কবিরা আঙ্গিকে পটু নন, এই উক্তির উত্তরে বলে দেওয়া যায়, বাজে কথা, শারীরিকভাবে নিখুঁত কবিতার সংখ্যাই একালে বেশী। ঠিক তেমনি, এ-কালের কবিরা আগের যুগকে অস্বীকার করতে চান, এই কাঁদুনির উত্তরে বলা চলে, করাই তো উচিত, বস্তুত সর্বকালের কবিরাই তা করে থাকেন, কেউ নীরবে করেন, কেউ ঢাকঢোল পিটিয়ে, তফাত মাত্র এইটুকুই। উপরন্তু, অস্বীকৃতির যে দরকার নেই, এমনও নয়, নিতান্ত নতজানু হয়ে আগের যুগকে সর্বতোভাবে-অভ্রান্ত বলে স্বীকার করে নিলে নতুন-কিছু করবার তাগিদ আসবে কোত্থেকে? অভিযোগ আরও অনেক, মামুলী অবান্তর অভিযোগ, কখনও অবাস্তবতা, কখনও দুর্বোধ্যতা, কখনও অশ্লীলতা, উপলক্ষের তো অভাব হয় না, একটা-কিছু তর্ক একবার উঠলেই হল, চতুর্দিকে অমনি প্রশ্নের বান ডেকে যায়। ডাকুক, তা নিয়ে কোনও দুঃখ নেই, দুঃখিত সম্ভবত তরুণ কবিরাও নন, বয়োবৃদ্ধদের উষ্মার, আপত্তির লক্ষ্য হতে তাঁদের সম্ভবত ভালই লাগে, দুঃখ শুধু এইখানে যে, যেটা আসল প্রশ্ন, সেইটাই কাউকে তুলতে দেখি না। ভুলেও কেউ একবার জিজ্ঞেস করেন না

যে, এই যে অসম্পূর্ণতা, দর্শন ও নির্মাণের এই যে খণ্ডতা, কবিতাকে এর কবল থেকে উদ্ধার করবার উপায় কী ?

আমি ধরেই নিচ্ছি যে, যদিও উচ্চারিত হয় না, তবু পাঠকদের মনে এই প্রশ্ন ইতিমধ্যে জেগেছে। সুতরাং সেই ট্রেনের উপমাতেই আমি ফিরে যাব, ট্রেনের দু'পাশ দিয়ে ছিটকে ছিটকে যে-সব দৃশ্য পিছনে চলে যাচ্ছে, তার দিকে আঙুল তুলে বলব, আমরা নিজেরাও তো কোনও-কিছুই সমগ্রভাবে, সম্পূর্ণ করে দেখতে পাচ্ছি না।

কোনও-কিছুই না ? আমার উত্তরের মধ্যে ফাঁকি আছে, আমি জানি। সবকিছুই যে অস্থির, তা তো নয়। ছুটন্ত এই ট্রেনের থেকেও দেখতে পাচ্ছি, কাছের দৃশ্যগুলি যখন এত অস্থির, দূরের পাহাড় ও গ্রাম, দূরের মানুষগুলি তখনও অচঞ্চল, আমার চোখের সামনে থেকে তারা দ্রুত সরে যাচ্ছে না, দূরের সূর্যও সেই তখন থেকে পাহাড়চূড়ায় লগ্ন হয়ে আছে।

অনেকক্ষণ তো কাছের দৃশ্যে, তাৎক্ষণিকে লিপ্ত ছিলুম, সম্ভবত এখন আর-একটু দূরে আমাদের চোখ রাখতে হবে।

রাজনগর

অমিয়ভূষণ মজুমদার

সুতরাং সর্বরঞ্জন স্থির করলো স্কুলের থেকেই সে দেওয়ানজির সঙ্গে দেখা করতে যাবে। না, না তাকে যেতেই হবে। প্রথমত আসবাবগুলির জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দেয়া উচিত। উপরন্তু ভাদুড়ীমশায় (যিনি নাকি তার মুরুব্বি এবং দেওয়ানজির বন্ধু) শেষ চিঠিতেও দেওয়ানজির কুশল কামনা করেছেন। সে সংবাদটা তাঁকে দেয়া দরকার। এভাবেই তাকে অগ্রসর হতে হবে, কেননা সে সংবাদটা তাঁকে দেয়া দরকার। এভাবেই তাকে অগ্রসর হতে হবে, কেননা সে তো দেওয়ানজির মতো কেউ নয় যে এই গ্রামে ব্রাহ্মমন্দির হোক বললেই ব্রাহ্মমন্দির হবে।

স্কুলের কাজের অবসরেও নিওগি এ বিষয়েই চিন্তা করলো। ঈশ্বর ব্যতীত তার উপায় কী? তার তো হাকিম হওয়া সম্ভব নয়, কিংবা অ্যাটর্নির আর্টিকেলড্ ক্লার্ক।

দেওয়ানকুঠিতে যখন গিয়ে পৌঁছালো নিওগি তখন হরদয়াল তার লাইব্রেরিতে। নিওগির বেশ একটু অস্বস্তিই বোধ হলো। একটি গৃহ যে এমন নিঃশব্দ হতে পারে তা তার অভিজ্ঞতায় ছিলো না। বারান্দায় দাঁড়িয়ে কুঠির ভিতরে কোন দেয়ালঘড়ির মৃদু টিক্‌টিক্ যেন শুনতে পেলো সে। কি ক'রে বা সে খবর দেবে যে সে দেখা করতে এসেছে। অবশেষে একজন ভৃত্য বেরিয়ে এলো। সে-ই যোগাযোগ ক'রে তাকে দেওয়ানজির কাছে নিয়ে গেলো। এই সময়ে সে একটা বিশেষ অসুবিধা অনুভব করলো। তার জুতোজোড়া যে একরকমের কিম্ভুত শব্দ করে, শান্তির বিঘ্ন ঘটায় তা আগে সে জানতো না।

ডেস্কের সামনের চেয়ারটায় তাকে বসতে ব'লে হরদয়াল মুখ তুললো। তখন একবার মনে হলো নিওগির এমন ক'রে আসাটা তার ভালো হয় নি। সেই লাইব্রেরি ঘরের বইঠাসা সেলফগুলি, কারুকার্যকরা ডেস্ক, চেয়ার, টিপয়, টিপয়ের উপরে রাখা বোতল গ্লাস প্রভৃতি লক্ষ্য করে সে যেন বৃথা সাহস সঞ্চয় করার চেষ্টা করলো।

কিন্তু হঠাৎ হরদয়াল হাসলো। আর সে হাসি যেন কোন রমণীর হতে পারে এমন তা নরম এবং কুণ্ঠিত। হরদয়াল বললো,—আপনার সব কুশল তো? আপনার কথা আমি প্রায়ই ভাবি। সাহিত্যের লোক আপনি। আর এখানে ছাত্রদের তো প্রাইমার মাত্র পড়াতে হয়। একটু অসুবিধাই হচ্ছে আপনার।

সর্বরঞ্জন প্রসাদ বললো,—পরম করুণাময় ঈশ্বরের যদি তাঁর এই কর্মশালায় আমাকে আহ্বান করার ইচ্ছা হয়ে থাকে, তবে, সার, এখানে আনন্দিত হওয়াই আমার কর্তব্য।

উত্তর দিতে হরদয়ালের একটু দেরি হলো। একটু ভেবে দেখতে গেলে সর্বরঞ্জন প্রসাদ নিওগির সঙ্গে এটাই তার দ্বিতীয় কথাবার্তা। প্রথমটা হয়েছিলো প্রায় এক বছর আগে চাকরিতে বহাল করার সময়ে সেই ইণ্টারভিউ। সে আলাপটা হয়েছিলো ইংরেজিতে। নিওগির ইংরেজিটাকে তার আধুনিক এবং ক্রিস্পই মনে হয়েছিলো। অন্যদিকে অবশ্যই সর্বরঞ্জনের এই বিশেষ ধরনের বাংলা

তাকে পুরোপুরি স্তম্ভিত করতে পারলো না কেন না কলকাতায় তার বন্ধু ভাদুড়ীর কোন কোন পরিচিত লোককে এরকম ভাবার কথা বলতে সে ইতিমধ্যে দু-একবার শুনেছে।

সে বললো,—তবে তো কথাই নেই। আপনার পরিবারের সকলের স্বাস্থ্য ভালো থাকছে তো? যে কারণেই হোক এ অঞ্চলটায় ম্যালেরিয়ার উৎপাত কম।

নিওগি আবার বললো,—এ বিষয়েও তাঁরই মঙ্গলময় বিধান আমরা দেখতে পাই।

সে সুন্দর ক'রে হাসলো। অর্থাৎ তার প্রচুর শ্মশ্রুজালে আবদ্ধ হাসি যতটা সুন্দর হতে পারে।

হরদয়াল বললো,—এর আগে করা যায় নি, এবার ভেবেছি আপনার কোয়ার্টারটাকে আর একটু বড় ক'রে দেবো।

কিন্তু আলাপটা গতি নিতে পারছে না তা বোঝা গেলো। হরদয়াল তো শুনতে প্রস্তুতই কিন্তু সর্বরঞ্জন প্রসাদ অনুভব করলো কলকেতায় সমাজের সকলের সঙ্গে যেভাবে আলাপ করা যায় এমন কি এখানে মিস্টার বাগচীর সঙ্গেও যেভাবে কথা বলা যায় এখানে এই ব্যক্তিটির সম্মুখে—যার, চারিদিকে সেল্ফে সেল্ফে বই, যার ডেস্কের উপরে খোলা বই এবং পাশে মদের সরঞ্জাম, যার বড় বড় চোখের দৃষ্টি স্থির অচঞ্চল, তার সম্মুখে—আরও চিন্তা ক'রে কথা বলতে হবে। হঠাৎ তার অনুভব হলো সমাজের বিত্তশালী অংশে কলকেতায় যেভাবে আলাপ করা যায় এখানে বোধ হয় তা যায় না। তার পুত্রের নামকরণের উৎসব সম্বন্ধে কল্পনায় যে সব আয়োজন করেছিলো সেই কাগজের মালা, কাগজের ফুল, সেই জলচৌকির সাহায্যে তৈরি অস্থায়ী প্রার্থনাবেদী সবই যেন তাকে বিদ্রূপ ক'রে উঠলো। অথচ এই নিস্তব্ধ লাইব্রেরিতে ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দে সময়টা দ্রুত চলে যাচ্ছে, অপব্যয় হচ্ছে, এবং সময়টা হরদয়ালের।

সর্বরঞ্জন নিওগি মাথাটা একবার উঁচু নিচু করলো, বললো,—সার, আজ যে আপনার মহামূল্যবান সময়ের খানিকটা এই যে অপব্যয় করতে উদ্যত হয়েছি, এই যে আপনার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটিয়ে চলেছি, এ সবেরই একটা উদ্দেশ্য আছে।

—বলুন।

—এখানে নববিধানের নামে একটা উপাসনামন্দির হলে খুব ভালো হতো।

—উপাসনার ব্যাপার, আমার মনে হয়, মিস্টার বাগচী সব চাইতে ভালো বোঝেন।

—আমি নববিধানের কথা বলছিলাম সার।

—সেটা কী ব্যাপার হচ্ছে?

সর্বরঞ্জন প্রসাদ তার চিন্তাগুলিকে গুছিয়ে নিলো। বললো,—বিষয়টা আনন্দজনক নয়, সার, তা আপনাকে বলতেই হবে। না, না, তা না ব'লে উপায় নেই। কিন্তু ঈশ্বর নিরানন্দের মধ্যেও নিজেকে প্রকাশ করেন; এই তাঁর অভিরুচি।

—বলুন।

—বিষয়টা আত্মসমালোচনাও বটে। বিশেষ তা আমাদের সমাজেরই একাংশের নিদারুণ গোঁড়ামির কথা। ব্রাহ্মদের অর্থাৎ যারা কি না পরম ব্রহ্মর উপাসনা করি তাদের কাছে কে ব্রাহ্মণ, কে শূদ্র এ বিচার কি থাকা উচিত? পরম ব্রহ্মের নিকট কি ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণে ভেদ আছে? দেবেন

ঠাকুর মশায় আচার্য হিসাবে অব্রাহ্মণকে গ্রহণ করতে রাজী নন। বলুন, এটা কি উচিত হচ্ছে?

হরদয়ালের মনে হলো সে বলবে দেবেন ঠাকুর কলকেতার মানুষ, যদিও কলকেতার বাইরে তাঁদের জমিদারি আছে। কিন্তু উপাসনা সম্বন্ধে তাঁর কী মত তা ভাবতে হবে কেন? কিন্তু সে কথাটাকে ঘুরিয়ে বললো,—এ বিষয়ে আমাদের অর্থাৎ এই অঞ্চলে করণীয় কিছু আছে কি?

আবেগের প্রাবল্যে নিওগির মাথাটা দুলে উঠলো, গোড়া থেকেই বাঁধ বেঁধে অগ্রসর হওয়া ভালো।—না, না এ কথা আমাকে বলতেই হবে, সার। এই গ্রামে একটা নববিধান ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হোক এই বাসনা করি। সেই সংবিধানে আচার্য হিসাবে যে কোন সম্প্রদায়ের লোকই উপাসনায় নেতৃত্ব দেবেন।

হরদয়াল হেসে বললো,—হলে তো ভালোই হবে হয়তো।

তার হাসির কারণটা একটু সূক্ষ্মই ছিলো, কারণ সে অনুভব করলো এক ব্রাহ্ম-সমাজ যদি আদি, সাধারণ ও নববিধান তিন সম্প্রদায়ে ভাগ হয় তবে তাও এক সাম্প্রদায়িকতাই হয় যা সর্বরঞ্জন লক্ষ্যে আনছে না। তার মনে পড়লো তার বন্ধু একবার এ রকমের কিছু লিখেছিলো। কিন্তু এ ব্যাপারে কৌতূহল না থাকাতে সে ভুলে গিয়েছে। এ ব্যাপারে কেশব সেন মশায় কিভাবে যেন জড়িত, আর তার বন্ধুর ভাষাও উত্তেজিত ছিলো। সে বললো আবার,—কিন্তু এখনো তো আপনি মাত্র একা, এখানে আপনার মতের বিরুদ্ধে কে দাঁড়াচ্ছে আর? আপনাদের শুনেছি উপনিষদ নিয়ে ব্যাপার। আপনার ব্যাখ্যার সঙ্গে এ অঞ্চলে বিরুদ্ধমত মাত্র একজনেরই হতে পারে। তিনি শিরোমণি। তাঁকে আমরা ধর্তব্য মনে করছি না।

—না, না, সার, একথা আমাকে আবার ক'রে বলতে হবে, সার। মন্দিরটা করা কি ভালো নয়? আর সে মন্দিরে প্রথম প্রধান ও পরমপূজনীয় আচার্য রূপে আপনাকে পেতে চাই যে, সার। তা ছাড়া একাই বা কেন। আমার পরিবারের সাত-আটজন আমরা নববিধানকেই স্বাগত জানাবো। একেবারে গোড়া থেকে বেঁধে অগ্রসর হওয়া কি ভালো হচ্ছে না?

হরদয়ালের আবার হাসি পেলো। সর্বরঞ্জনের পরিবারের সাত-আটজনের মধ্যে দু-তিন বৎসরের শিশুরাও আছে। তাদের ধর্মমত উল্লেখে সে কৌতুক বোধ করলো। কিন্তু বাড়িতে যে দেখা করতে এসেছে সে পরিহাসের বিষয় হয় না। সে বরং আবার শান্ত দৃষ্টিতে সর্বরঞ্জনের দিকে চাইলো। এত বিস্তৃত সে দৃষ্টি যে সর্বরঞ্জন লক্ষ্য করলো তার চোখের কোণগুলি বিশেষ রক্তাভ।

হরদয়াল বললো, মিস্টার নিওগি, আপনি এমন সময়ে এসেছেন যে কী দিয়ে আপনাকে পরিচর্যা করি বুঝে উঠতে পারছি না। তা ছাড়া জানেন তো আমার চাকর-বাবুর্চির সংসার। আপনাকে কি কিছু পানীয় অফার করতে পারি?

এই ব'লে সে পাশের বোতলের দিকে হাত বাড়ালো।

সর্বরঞ্জন জীবনে এমন বিপন্ন হয়েছে কিনা সন্দেহ। যা উপস্থাপিত হ'লে ডানকান সাগ্রহে গ্রহণ করতো, যা উপস্থাপিত না হ'লে পিয়েত্রো নিজেকে অসম্মানিত অনুভব করতো, সর্বরঞ্জনকে তা একেবারে নির্বাক ক'রে দিলো। বাগচী হলে হয়তো বলতো,—ধন্যবাদ, দেওয়ানজি, এখন নয়।

কিন্তু তার আপত্তিটি বুঝতে পেরে হরদয়ালই বরং অন্যকথায় এলো। সে বললো,—মিস্টার

মিস্টার বাগচী আপনার সাহিত্যজ্ঞানের প্রশংসা ক'রে থাকেন। আপনি যে ইংরেজ কবিদের কয়েকজন সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান রাখেন তাও শুনেছি। আপনি কিন্তু গ্রামের বয়স্কদের একটা মহৎ উপকার করতে পারেন।

অন্য আলাপে যেতে পেরে নিঃশ্বাস নিতে পারলো নিওগি। বললো সে,—কিভাবে, সার, বলুন, সাধ্য হলে নিশ্চয় করবো।

—আপনি কি শেক্সপীয়রের 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট' অনুবাদ করতে পারেন ?

—তা হয়তো করা যায়, কিন্তু—

—হয়তো প্রথমটায় নিছক ভাষান্তরিত ছাড়া কিছু হবে না।

—কিন্তু—

—কী হবে বলছেন ? গ্রামের যুবকদের একাংশ হঠাৎ থিয়েটার করতে উদ্যত হয়েছে। কী করবে জানি না। কিন্তু ভালো নাটক কই ? ওরা এবার 'বুড়ো শালিখ' করছে। আমার কাছে কুরুচিপূর্ণ লেগেছে। এর চাইতে শেরিডান কিংবা কংগ্রিবের নাটক অনুবাদ ক'রে অভিনয় করাও ভালো হয়।

সর্বরঞ্জন প্রসাদ অনুভব করলো আবার সে এক সমস্যার সামনে এসেছে যেখানে সে কোন্‌দিকে এগোবে তা বুঝতে পারছে না। সে না চাইতেই এই সমস্যাটার কথা উঠে পড়েছে। অংশত তার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে দেওয়ানজির দৃষ্টিভঙ্গি মিলছে। কিন্তু মিলটাই আরও বিপজ্জনক। এই নাটকটা কুরুচিপূর্ণ হতে পারে, কিন্তু তাঁর কথার এই ব্যাখ্যা হয় যে তারা ভালো ক'রে অভিনয় করলে দেওয়ানজির সমর্থন ও প্রশ্রয়ই পাবে।

সর্বরঞ্জন নিওগি কিছুই বলতে পারলো না। সে অনুভব করলো এই অবস্থায় এই ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যাওয়াই তার মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে। কলকেতায় কারো বৈঠকখানা হলে সে তা করতো, কিন্তু এখানে দেওয়ানজি হরদয়ালের ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া যায় না, কেন না প্রকৃতপক্ষে এই লাইব্রেরি ঘরের বাইরে যে রাজপথ, যে স্কুল, শিক্ষকদের আবাসিক বাড়ি, এবং তারও পরে গ্রামের পরে গ্রাম কতদূর কে জানে, সবই দেওয়ানজির ঘর।

সাক্ষাৎ শেষ হয়েছে অথচ বিদায় নেয়ার ঠিক কথাটা ভেবে উঠতে পারছে না ব'লে ব'সে আছে এমন অবস্থাই যেন। এই সময়ে ঘড়িতে কোন এক আধঘণ্টার সূচনা করলো। পর্দার কাছে হরদয়ালের ভৃত্যের সাড়া পাওয়া গেলো।

নিওগি বললো,—আপনার স্নান-আহারের সময় হলো।

হরদয়াল বললো,—তা হলো। আপনি কিন্তু অনুবাদের কথা ভেবে দেখবেন।

নিওগি যেন কিছু লজ্জিতভাবে নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে পড়লো। ভৃত্য এসে জানালো রান্না কিছু আগেই শেষ হয়েছে।

হরদয়াল হাসিমুখে বললো,—চলো তা হলে, আর দেরি নয়।

তখন চিন্তার সময় নয়। হরদয়ালের তা সত্ত্বেও মনে হলো আমাদের এই নতুন মাস্টার মশায়ের মনে ধর্মভাব যত প্রবল সাহিত্যপ্রীতি তত নয়। কলেজে ভালো শিক্ষকের কাছে সাহিত্য-

চর্চার সুযোগ পেলে সেদিকে আকৃষ্ট থাকাই কি স্বাভাবিক হয় না? কিন্তু ধর্মের ভাবই প্রবল হচ্ছে, এখানে নয় শুধু, কলকেতাতেও। কিংবা একে কি ইংরেজি শিক্ষার সার্থকতা বলবে যে তার ফলে মানুষের মনে ধর্মভাব জেগে উঠছে?

আর দু-এক পা গোসলখানার দিকে এগিয়ে হরদয়ালের মনে হলো অবশ্যই নিরীশ্বর ধারারও দু-একজন আছেন। আরে র'সো র'সো, সেখানে তো বিদ্যেসাগর আছেন শুনেছি।

দুজনের চিন্তায় কখনও কখনও মিল দেখা যায়। পথে বেরিয়ে সর্বরঞ্জন ভাবলো: তা হলে এতদিন সে যা ভেবে এসেছে তা কি সবই ভুল? আর ভুল তা হলে তার একার নয়। মেট্রোপলিটানের ভাদুড়ীমশায়ও বন্ধুকে চেনেন না। ভাবো তো দুপুরের স্নানাহারের আগে ওই মদ্যের কথা! না, না, এ কথনোই গোপন করা যায় না যে তিনি নিতান্ত মদ্যাসক্ত। এবং ঈশ্বরেও বিশ্বাস আছে কি? অথচ ইংরেজিনবিশ সে বিষয়ে সন্দেহ কী? আহারে-বিহারে পোশাক-পরিচ্ছদে তাঁকে নিতান্ত আধুনিকই মনে হয়। গায়ে যেটা ছিলো ওকে তো নাইটগাউন বলে।

হঠাৎ সে যেন আবিষ্কার করলো, সত্য এভাবেই উদ্ভাসিত হয়। তা হলে দেওয়ানজি সেই ডিরোজিও ধারারই মানুষ; সেই নিরীশ্বর, দুর্বিনীত, মদ্যপায়ী আধুনিকদের একজনই হবেন।

কিন্তু তাকে, সেই ধারাকে এখন আর কি আধুনিক বলা যায়? বর্তমানের কেশব সেন মশায় এবং তাঁর সহকর্মীদের দেখো। না, না, একথা আমাকে বলতেই হবে, দেওয়ানজি সেই প্রজন্মের মানুষ যারা ভয়ঙ্কর রকমে আধুনিক ছিলো কিন্তু এখন আর কলকেতার চোখে আধুনিক নয়। না, আধুনিক নয়।

স্কুলে পৌঁছেও সর্বরঞ্জন নিজের এই আবিষ্কার নিয়ে নিতান্ত গম্ভীর হয়ে রইলো। নিজেকে সে নিঃসঙ্গ নিঃসহায় অনুভব করতে লাগলো। যে ক্লাসটা ছিলো স্কুল ভাঙার আগে সে ক্লাসে গিয়ে অন্যদিনের মতো পড়াতে উৎসাহ পেলো না। ক্লাস থেকে বেরিয়ে শিক্ষকদের বসবার ঘরের দিকে যেতে যেতে হঠাৎ তার চিন্তাটা শব্দকে অবলম্বন ক'রে পরিচ্ছন্ন হলো—হায়, আমি কি শহীদ!

শিক্ষকদের বসবার ঘরে তেমন কাজ ছিলো না। সে একবার মনে করলো পরীক্ষার যে প্রশ্নপত্রগুলো আগামী সপ্তাহে দিতে হবে সেগুলো একবার দেখলে হয়। কিছুক্ষণ তার দু-একটা নাড়াচাড়া করলো সে, কিন্তু উৎসাহটা তেলহীন প্রদীপের মতো। দেরাজ থেকে সে একটা খেরোবাঁধানো লম্বা ধরনের খাতা বার করলো। এটা তার ডায়েরি। ক্লাসে কী পড়ানো হলো, কী পড়ানো উচিত তা যেমন লেখা থাকে, তেমন লেখা থাকে তার নানা সময়ের চিন্তা। এটা অবশ্য তার সে ডায়েরি নয় যা সে বাড়িতে প্রত্যহ সন্ধ্যায় উপাসনার শেষে লেখে। এই দুই নম্বর ডায়েরিতে যে সব কথা থাকে পরে মার্জিত হয়ে সেই এক নম্বরে স্থান পায়।

দুই নম্বর ডায়েরি লিখতে লিখতে সর্বরঞ্জন নিওগি লক্ষ্য করলো টেবিলের অপর প্রান্তে শিরোমণি এসে বসেছে। তার দিকে কয়েকখানা চেয়ার বাদ দিয়ে চরণদাস একটা বাঁধানো খাতায় রুল টানছে। নতুন বছরের অ্যাটেণ্ড্যান্স রেজিস্টার। চরণদাসের পরনে কতকটা আচকান জাতীয় পিরহান। তার উপরে পাকানো চাদর। শিরোমণির গায়ে খাটো ঝুলের খাটো হাতার সুতোর

মেরজাই। তার গলার কাছে মোটা পৈতার গোছা চোখে পড়ছে, চোখে পড়ানোটাই উদ্দিষ্ট। মোটা সুতোর চাদর আলগাভাবে গায়ে জড়ানো। শিরোমণির দিকে চাইলেই সব চাইতে বেশী যা চোখে পড়ে তা তার ধবধবে সাদা কিন্তু অত্যন্ত মোটা টিকির গোছাটাই।

সর্বরঞ্জন বললো,—চরণদাসবাবু কি এখনই আগামী বছরের কাজ করছো? নাকি ওটা তোমাদের থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত কিছু ?

চরণদাস মুখ তুললো,—আগেরটাই ঠিক। সে হাসলো। থিয়েটার সম্বন্ধে ইতিপূর্বে নিওগির সঙ্গে তার কিছু তর্ক হয়েছে।

সর্বরঞ্জন বললো,—ভয় নেই তোমাদের। তোমাদের থিয়েটারকে কেউ এখানে নিন্দে করবে না।

থিয়েটার নিয়ে কোন আলোচনা সর্বরঞ্জন ইতিপূর্বে এখানেও করে থাকবে। শিরোমণির কাছে সে জন্য থিয়েটার শব্দ নতুন লাগলো না। সে বললো,—তা কি বলা যায় ? ঠিয়াটার বলুন কিংবা অভিনয়, অপরিতোবাদ্ বিদুষাং ন সাধু।

চরণদাস বললো,—উনি সে অর্থে বলছেন না বোধ হয়।

—কথাটা ঠিকই ধরেছো। এই বললো সর্বরঞ্জন, কিন্তু তার পরেরটুকু বলতে গিয়ে সে দ্বিধা করলো। দেওয়ানজি যাঁকে বলা হয় এখনও তিনি যে অভিনয়ের বিরুদ্ধে নন, বরং যেন প্রশ্রয়ের ভাবই আছে তাঁর, এ কথাটা বলার ঔচিত্যে তার সন্দেহ হলো। তার নিজের কাছে এমন প্রশ্রয় দেয়া নিশ্চয়ই নীতিগর্হিত।

মৃদু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললো,—মুশকিল কি জানো, চরণদাস বাবু, মানুষকে দেখে যা ধারণা করো আর তার প্রকৃত ব্যবহারে অনেক তফাত।

—যথা ?

এবারেও নিওগির মনে দ্বিধা দেখা দিলো। সে কি বলতে পারে আজই হরদয়াল সম্বন্ধে তার ধারণাকে হরদয়ালের ব্যবহার ভীষণ রকমে আঘাত করেছে। সে বললো,—জানো, খিদিরপুরে এক মিত্তিরজা আছেন, যিনি নতুন ধর্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মধর্মকে আলিঙ্গন করেছেন। কিন্তু তা করার আগে নিজেদের গৃহবিগ্রহ গোপীনাথ প্রভৃতিকে গোপনে এক মন্দিরে দিয়ে এসেছেন ; যাতে সেই অবস্থাতেও পূজা হয় সে জন্য আটদশ বিঘা জমি কিনে দিয়েছেন।

—কৌতুকের ব্যাপার তো। শিরোমণি বললো,—বিবেকের সঙ্গে রফা করা।

—আমার কিন্তু মশায় তা নেই। আমি মিথ্যা ব্যবহারে অনভ্যস্ত। আমাদেরও গৃহবিগ্রহ শালগ্রামশিলা ছিলো।

—আপনি বুঝি তা গঙ্গায় দিয়েছেন ? চরণদাস আর কয়েকটা লাইন টেনে মুখ তুললো।

—রসো, রসো, চরণদাস, শিরোমণি বললো, ওঁর কথা ওঁকেই বলতে দাও। গঙ্গায় দেয়া তো হিঁদুয়ানিই হলো।

নিওগি বললো,—আপনি যদি দয়া ক'রে আমার বাসায় যান তা হলেই দেখতে পাবেন। আমি, মশায়, আমার সেই শিলাকে টেবলে রেখেছি। তা এখন কাগজ-চাপার কাজ করছে।

আমার ছেলেমেয়েরা সেটাকে নিয়ে খেলা করলেও আমার আপত্তি নেই। বরং তা ক'রেই তারা সংস্কারমুক্ত হবে। এই ব'লে নিওগি হাসলো। বললো আবার,—না, না, আমাকে বলতেই হবে, আজ পর্যন্ত সেই পাথর থেকে নূপুরের শব্দও শুনিনি, বাঁশির শব্দও না, এমনকি কোন কিশোর কেঁদে ফিরছে তাও মনে হয়নি।

শিরোমণি হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে হেসে উঠলো। বললো,—এখানেই আপনার চিন্তার ক্রটি আছে কিনা দেখুন। যখন তাকে নুড়ি মনে করলেন তখন আর তার থেকে নূপুরের শব্দ আশঙ্কা করছেন কেন?

চরণদাস বললো,—তা হলে উনি যাকে নুড়ি মনে করছেন তা নুড়িই হয়ে যায়?

—তাই তো হ'য়ে থাকে। তোমার কাছে যা একটা রক্তমাখানো ফাঁসি-কাঠ কারো কারো কাছে সেটাই পূজনীয় অবতারের প্রতীক। হয়তো নিওগিমশায় সে রকম একটা কাঠ দেখলে যুক্তকর অন্তত বুক পর্যন্ত ওঠান। তুমি যাকে নুড়ি মনে করেছো তা থেকে কি বাঁশরী শোনা যাবে কিংবা ডমরু?

নিওগি এদিক ওদিক চাইলো। তার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠলো। মনে হলো তার মুখে যে শক্ত শক্ত শব্দগুলো এসেছে সেগুলো আয়ত্তে রাখা কঠিন হচ্ছে। সে বললো,—সত্য গোপন করা আমার অভ্যাস নয়। সেজন্যই স্বীকার করি আপনি যাকে ফাঁসিকাষ্ঠ বলছেন তাকে ক্রশ বলে এবং তা দেখলে যুক্তকর বুক পর্যন্ত উঠে শ্রদ্ধা জানালে লজ্জার কিছু দেখি না! আপনি ইংরেজি জানলে আপনাকে কেশব সেন মশায়ের একটা বক্তৃতা পড়তে দিতুম। দেখতেন বড় বড় ইংরেজরাও তার কত প্রশংসা করেছে। আর তা খ্রীষ্ট সম্বন্ধেই। না, না একথা আমাকে বলতেই হবে আমাদের এই দেশে এমন প্রতীকও পূজা করা হয় যা স্বীকার করতেই হবে যে কোন সৎব্যক্তির মাথা নীচু হয়। তার তুলনায় ক্রশ?

—আপনি কি ওলাবিবি, শীতলা প্রভৃতি ঠাকুরানীর কথা বলছেন? চরণদাস রুল টানা শেষ ক'রে খাতা বন্ধ করলো।

—না। আমি তোমাদের দেবতার দেবতা মহাদেবের কথা বলছি।

কোন কোন কথা একটা আলগা ধরনের আলাপকে হঠাৎ যেন বিদ্যুতের আঘাতে সজীব ক'রে তুলতে পারে। এই ক্লাসটা শেষ হলে ঘণ্টা পড়বে এবং তখনই স্কুলের ছুটি। শিরোমণির তখন গৃহে ফেরার কথাই মনে হচ্ছে। টেবলের উপরে তার হাতের কাছে স্কাইলাইট থেকে আলো এসে পড়েছে। শিরাচিহ্নিত তার হাত দুখানা যেন রোদ পোহানোর ভঙ্গিতে সেদিকে ছিলো। শিরোমণি ডান হাত তুলে তার শিখাটাকে ঝাড়লো যেন।

—সে তো একটুকরো কাদা থেকে তৈরি কিংবা একটুকরো পাথর থেকে। কাদা বা পাথরে কি লজ্জার কিছু আছে।

—কিন্তু আকৃতি? বিশেষ ক'রে এই গ্রামে—। সর্বরঞ্জন প্রসাদ যেন জুগুপ্সিত বোধ ক'রে থেমে গেলো।

শিরোমণি বললো,—অ। তা বিশেষ ক'রে এই গ্রামে কেন?

—নতুন শিবলিঙ্গের গোড়ায় কারো বুকের রক্ত দেয়া হয়।

—যৌনগন্ধী বলছেন ?

—আপনি ব্রাহ্মণ। আপনিও স্বীকার করছেন শিবপূজায় রক্তচন্দনও অবিধেয়। রানীমা সম্বন্ধে আপনি যে কথাটা বললেন তা আমি উচ্চারণ করতে চাই না, বিশেষ স্কুলে ব'সে।

—অর্থাৎ চিন্তা গোপন করছেন। সেটাও কিন্তু সত্য ব্যবহার হয় না। শিরোমণি হাসলো।

—তা হ'লে শুনতেই চান ? ওকে আমি পশুত্বের পূজা বলি।

শিরোমণির কৃশ শরীরে সবগুলি শিরাই প্রকাশমান। কপালের ঠিক মাঝখানে যে শিরা সেটা যেন রক্তের চাপে ফুলে উঠলো। কিন্তু সে হঠাৎ ঠা ঠা ক'রে হেসে উঠলো। সে বললো,—খুব বলেছেন। আমি শুনেছি সাহেবদের শিশুরা রুমালে বাঁধা অবস্থায় সারস দ্বারা নীত হয়। আপনাদেরও তা হয় কি না জানি না। আপনি বাঙালী। ভেবে দেখুন নিজের জন্ম অথবা নিজের সন্তানের জন্ম পশুত্বের স্তরে কিনা। আমরা স্বর্গদ্বার থেকে ভূমিষ্ঠ হই কিন্তু। যদি বলেন এই একবারই জন্মানোর সুযোগ পেয়েছি, এ জন্ম সার্থক, তবে সেই সার্থকতার উৎস, জীবনে সবটুকু আনন্দের উৎস—মাতৃযোনির মতো কী এমন পবিত্র মশাই ?

—ছি-ছি-ছি, এসব আপনি কী বলছেন। নিয়োগী দুহাতের দুই তর্জনী নিজের দুকানে অনেকটা ঢুকিয়ে দিলো।

শিরোমণি বললো,—মস্তিষ্কের সাহায্যে ব্যাপারটা দেখুন। মনের প্রবীণতায় হয়তো পবিত্রতার বোধ বদলাবে। আপনারা রক্তমাখানো কাঠ, যা মৃত্যু ও বেদনার স্মৃতি বহন করে, তা যদি সামনে রাখতে পারেন, তাহলে আমরা যদি আনন্দ ও জন্মের প্রতীককে সামনে রাখি, তাতেই কি দোষ ?

ঢং ঢং ক'রে ঘণ্টা বাজলো। ঘরের বাইরে ক্লাসে ক্লাসে ছুটির ঘণ্টা শুনে ছেলের দলের হৈ-চৈ ফুটে উঠলো। শিরোমণি তার শিখা আন্দোলিত ক'রে উঠে দাঁড়ালো। বললো,—নমস্কার মশায়। বুড়োর কথায় দোষ নেবেন না।

কিন্তু সেদিন ভবিতব্য অন্যপ্রকার ছিলো। বাইরে গুড়িগুড়ি বৃষ্টি হচ্ছিলো যা এরা ভিতরের দিকের ঘরে ব'সে বুঝতে পারে নি। দরজার কাছে গিয়ে শিরোমণি ভিজে বাতাসের তাড়া খেয়ে পিছিয়ে এলো। অন্যান্য শিক্ষকেরাও পিছিয়ে এলো দরজা থেকে। টেবলের কাছে এসে শিরোমণি বললো,—খুব ধমক খেলাম হে, চরণ। জল হচ্ছে।

—তাড়া কী। বসুন না হয়।

শিরোমণি আবার তার চেয়ারে বসলো।

নিওগির বোধ হয় এমন স্পষ্ট (তার কাছে নির্লজ্জ) কথা শোনার অভ্যাস ছিলো না। সে কথা খুঁজে পাচ্ছিলো না। শিরোমণিকে ফিরে চেয়ারে বসতে দেখে সে বেশ তিক্তস্বরে বললো, —আপনার এই অনুভূতিগুলিকে আমি অত্যন্ত নিম্নস্তরের ব'লে মনে করি। একথাটা আপনাকে জানানো দরকার।

—আপনি ঠিকই বলেছেন। এগুলো সেই স্তরের কথা যখন শিবলিঙ্গে মানুষ জগৎপিতরৌকে দেখতে পাচ্ছে না। হ্যাঁ হে চরণ, তুমি কি কালিদাস পড়েছো ?

নিওগি বললো,—আমি পড়েছি, আমাকে বলুন। কালিদাস শৈব ছিলেন এই বলবেন?

—না। কালিদাস ঋতুসংহারের লেখক আবার কুমারসম্ভবেরও লেখক। ঋতুসংহারের আদিরসাত্মক শ্লোকগুলি আজকাল আমরাও পড়াতে ইতস্তত করি। সেই লেখকই আবার কুমারসম্ভব লেখেন। আসল কথা কি জানেন, মানুষকে ঋতুসংহারের স্তর থেকে কুমারসম্ভবের স্তরে পৌঁছাতে হয়। ঋতুসংহারকে অস্বীকার করা বোকামি।

নিওগি বললো,—এতে কিছুই প্রমাণিত হয় না।

—না, এটা প্রমাণ নয়। তুলনা মাত্র। আপনি হয়তো শকুন্তলাও পড়েছেন। ওটা ভারি মজার। প্রথমে তো শিবকেই প্রণাম। শেষে আবার ভরত যার নামে কিনা ভারতবর্ষ তার প্রতিষ্ঠা। মাঝখানে কামজ মিলন থেকে আর একটি কুমারসম্ভবের পবিত্রতায় পৌঁছানো। আমার প্রত্যয় ভরতকে সমস্ত ভারতবর্ষের আদিপুরুষ ব'লে জানলে কালিদাসের পরিকল্পনার এই এক ব্যাখ্যা হয় যে তা ইঙ্গিত করছে, মানুষ কামজ অস্তিত্বের স্তর থেকে ক্রমশ শিবত্বে পৌঁছাতে পারে। আদিরসকে বাদ দিয়ে কাব্য নয়, তার জন্য লজ্জিত হয়ে নয়, তাকে দেবত্বের সার্থকতায় চালিত করেই কাব্য হয়। আমার তো মনে হয় মানুষজাতির ইতিহাসও তাই। মানুষকে দেবতা দিবিচ্যুতা বলাই ভুল যদিও আপনারা ভাবেন ভগবান নাকি আদিম পুরুষকে কোন উদ্যান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। বরং সে পশুত্ব থেকে ক্রমশ উর্ধ্বে যেতে চায়। কিছু উন্নতি হয়েছে।

নিওগি বললো,—থাক, হয়েছে। কিন্তু এতেও আপনার ওই বিশেষ পূজা সমর্থিত হয় না। এই ব'লে সে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো।

—শিরোমণি বললো,—হয়। কারণ লিঙ্গরূপী শিব মানুষের এই উর্ধ্বযাত্রারই প্রতীক। যতক্ষণ না তাকে জগৎপিতা বলে বোধ হচ্ছে, জন্ম ও মৃত্যুর নিয়ামক ব'লে বোধ হচ্ছে, তার মধ্যে যোগীশ্বরকে দেখতে পাচ্ছে, ততক্ষণ না হয় নিজের প্রাণশক্তির উৎস ব'লেই মানুষ তাকে উপাসনা করুক। সেটাও অনেক—যদি তা প্রত্যয়ে আসে।

শিরোমণি অভ্যাসবশে শিখায় হাত রাখলো। যেন সেটাকে বাঁধবে ফুল দিয়ে। কিন্তু আচমকা অন্যদিকে গেলো ঘটনার গতি। কে যেন বললো—আপনি কি শৈব?

পিছন ফিরে সে দেখলো বাগচী দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। তার দাঁড়ানোর ভাবে মনে হয় কিছু আগেই সে এসেছে। শিরোমণি বিশেষ বিব্রত বোধ করলো, কিছুটা যেন ভীতও।

সে কিছু ইতস্তত ক'রে বললো,—না, মহাশয়, আমরা বৈষ্ণব। বিষ্ণুকে উপাসনা করার চেষ্টা হয়।

—ও, আচ্ছা! কিন্তু আপনি তো বললেন যোগীশ্বর রূপ প্রত্যয়ে এলে তখন কী হয়। এটা আপনার বৈষ্ণবী বিনয়, শিরোমণি মশায়। বৃষ্টি থামে নি। আপনি বলতে পারেন।

শিরোমণি যেন লজ্জায় অধোবদন। কিন্তু সে লক্ষ্য করলো অন্য কয়েকজন তার মুখের দিকে চেয়ে আছে। হঠাৎ কি সে নিজেকে কোণঠাসা ব'লে অনুভব করলো? যেন সে কোন এক পরাজিত পক্ষের প্রতিভূ।

সে বললো,—তারপরেও কল্পনা করি তার অনুভূতিতে যোগীশ্বর সেই রূপ ক্রমশ আনন্দময়

মহাকালস্রোতে মিলিয়ে যায়, সে অনুভব করে সেই মহাকালস্রোতে তারই সমক্ষে সূর্যচন্দ্রতারকাদি জন্মাচ্ছে ও লোপ পাচ্ছে, সে নিজেও সূর্যচন্দ্রাদির মতো সেই মহাকালপ্রসূত এবং তাতেই বিলীন, সেই জগৎপিতা মহাকালকে অনুভব ক'রে তার জন্মের আনন্দ নেই মৃত্যুর ভয় নেই; তার সুখ নেই, দুঃখ নেই, সে কাউকে বিদ্বেষ করে না, কারো দ্বারা বিদ্বিষ্ট হয় না। সে যদি কখনও বলে আমিই শিব তা হ'লে তা মিথ্যা হয় না।

এই ব'লে শিরোমণি থামলো। তাকে অপ্রতিভ ও বিশীর্ণ দেখলো। সে ভাবতে লাগলো বাগচী কতখানি আলোচনা শুনেছে, না-জানি ভিন্নধর্মীয় তাঁর কাছে কী রকম বা লেগেছে সে আলোচনা। কেউ কেউ কবিৎকর্মা থাকে। কৈলাসপণ্ডিত ইতিমধ্যে দরজা পর্যন্ত গিয়েছিলো। সে বেশ সজোরে ঘোষণা করলো,—বৃষ্টি থেমেছে, সার।

বাগচী হেসে বললো,—পণ্ডিতমশায় দেখছি আলোচনাটা চলে তা চান না। বেশ, চলুন।

পথে বেরিয়ে শিক্ষকেরা এই ক্ষণস্থায়ী বর্ষায় শীত বাড়াবে কিনা, ফসলের পক্ষে ক্ষতিকর হবে কিনা ইত্যাদি আলোচনা নিয়ে ব্যস্ত রইলো।

শিরোমণি পিছনে ছিলো। বাগচী একবার ফিরে তাকে বললো,—এগুলি কি আপনার নিজেরই ব্যাখ্যা কিংবা কোন দর্শন থেকে বলেছেন?

শিরোমণি যেন নিজের মনের মধ্যে খোঁজ করলো। বললো,—নিশ্চয়ই পূর্বসূরীদের ভাষ্য থেকে পাওয়া, কিন্তু বিশেষ কোন দর্শনের নাম করতে পারছি না।

বাগচী এই কথাগুলি ভাবতে ভাবতে কিছুক্ষণ শিরোমণির পাশে চললো। সার্বভৌম পাড়ার পথে শিরোমণি স'রে গেলো। শীতের এই এক পশলা বৃষ্টি ধুলোকে জব্দ করতে পারেনি। বাতাস সৃষ্টি করে বরং ধুলোর উৎপাত বাড়িয়েছে। সে রকম একটা ঝাপটা ধুলো উড়িয়ে একবার শিরোমণিকে ঢেকে দিলো। চাদর তুলে নাক বাঁচালো সে কিন্তু মাথার সাদা চুলে এবং সর্বাঙ্গে ধুলোর একটা স্তর পড়লো যেন। ধুলোয় ঢাকা, ক্লান্ত এবং শীর্ণ।

কিন্তু নিজের বলা কথা চিন্তার সূচনা করতে পারে। ধুলোয় ঢাকা শীর্ণ শিরোমণি নিজের অজ্ঞাতে রামায়ণের ভাষায় চ'লে গেলো। কিছু বদল ক'রে সেই ভাষায় সে ভাবলো উনষোড়শবর্ষ পৌত্র সে রাজীবলোচন। আজ সন্ধ্যা থেকে তাকে ঋতুসংহার পড়াতে হবে। বিধবা ভ্রাতুষ্পুত্রী গৃহে থাকায় তার প্রতি করুণায় ঋতুসংহার কাব্য, মেঘদূত কাব্য পড়া হ'তো না। এখন আবার তা যায়। বাড়ির কাছাকাছি এসে সে ভাবলো: পৌত্র ও পুত্রে কি তাতে বিবাদ দেখা দেবে! এ-কথা কি সত্য, যা সে কল্পনা করেছে। পৌত্র ও পুত্রের ব্যক্তিত্ব ভিন্নমুখী। তার ছেলে, এবার দিয়ে সাত বছর হলো, কলকেতায় অর্থোপার্জনের জন্য। এবং অনেক বিষয়ে এই সাত বছরে সে কালের সঙ্গে আপোস করেছে। সে হাসতে হাসতে গতবার তার মাকে বলেছিলো সময়ও মুনিদের কাছে বেদের মতোই প্রমাণ। নাকি এটা প্রৌঢ়ত্ব ও যৌবনের তফাত যে প্রৌঢ়ত্বে আদর্শের চাইতে বাস্তববোধ বেশী মূল্যবান হয়। কলকেতায় বাস করলে খানিকটা কলকেতার মতো হতেই হয়। তার পৌত্রের উপরে বাড়ির সাবেকি ভাবটার প্রভাব বেশী। এ কি তার উচিত হচ্ছে?

সে আবার চিন্তা করলো কিন্তু রাজীবলোচন পৌত্রের বাহুও তো সুবলম্বিত পরিঘসদৃশ হওয়া

উচিত। ধনুক এখনও লাঠির চাইতে বেশী কিন্তু বন্দুকের কাছে কিছু না। অর্থাৎ ঋতুসংহার পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানের ধনুর্বিদ্যা অর্থাৎ বন্দুকবাজিতে ওস্তাদ না হ'লে কাব্যপাঠ কেমন যেন বৃথা হয়। ঋতুসংহার যাদের জন্য লেখা তারা ধনুর্ধর ছিলো।

কেন সে নিজে বুঝতে পারলো না তার স্মৃতিপটে রাজকুমারের ছবিটা ফুটে উঠলো। মাংসল স্কন্ধ এবং আজানুলম্বিত না হোক, বাহু দুটি সুবলয়িত। তাই নয়?

বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে নিজের চিন্তাগুলোকে যেন সে লক্ষ্য করলো। আশ্চর্য, এই সব সে কেন ভাবছে। এই যে সে ভাবছে তা কি কেউ কখনও জানবে? না, ভবিষ্যতের জন্য সে তার এই চিন্তাগুলোকে পুঁথির পাতায় অবশ্যই স্থান দেবে না। এবং এখনই এগুলি চিরকালের জন্য হারিয়ে যাবে।

বাগচীও বাতাসের ঝাপটায় পড়েছিলো। সে পথের ধারের ব্যস্তসমস্ত ডালপালাগুলোকেও দেখতে পেলো। আকাশে যে হাল্কা মেঘ তাতে কি আর বৃষ্টি হবে?

তারপর তার মনে হলো কী যেন ভাবছিলো সে? ও, শিরোমণির কথা। শিরোমণি কি নিজেই জানে না তার কথাগুলোর উৎস কোথায়? কিন্তু এটা তার নিজেরই চিন্তা। এটা নতুন দার্শনিক মত হতে পারে। নতুন দার্শনিক মত অনেক সময়েই তৎকালে প্রচলিত পুরনো দার্শনিক মতের বিবর্তন। কিন্তু এটা আশ্চর্য নয় কি যে এই গ্রামেও নতুন দার্শনিক চিন্তা হয়?

ঠিক এই সময়েই নিওগিকেও চিন্তা করতে হলো। সে মাথা নিচু করে হাঁটছিলো। সে অনুভব করছিলো আজকের আলোচনায় সে যেন পরাজিত হয়েছে। কিন্তু এই অলীক কল্পনা থেকে সে নিজেকে মুক্ত করলো। প্রকৃতপক্ষে ওটা আলোচনাসভা ছিলো না এবং সে কি সত্যই পরাজিত হয়েছে। বাগচীকে ঘরে আসতে দেখে সে থেমে গিয়েছিলো কেননা শিরোমণি তখন যে অরুচিকর যৌনবিষয়ক কথা বলছে তাতে অংশ নেয়া কোন শিক্ষিত লোকেরই উচিত নয়, স্কুলের ঘরে স্কুলের শিক্ষকের তো নয়ই।

কি আশ্চর্য দেওয়ানজি এঁকেই উপনিষদের ব্যাখ্যা করার উপযুক্ত বিবেচনা করেছিলেন! ঋতুসংহার? ঈশ্বর আমাদের পাপকথন থেকে রক্ষা করুন। যখন সে নিজে সংস্কৃত কলেজে কিংবা আসল কলেজে পড়বে এই নিয়ে তার অভিভাবকরা চিন্তা করছে তখন সমবয়সী একজন তাকে সংস্কৃত কলেজের কথায় কালিদাসের কথা বলেছিলো। হে ঈশ্বর, কালিদাসের শ্লোকগুলি কি কোন ভদ্র পরিবারে উচ্চারণ করাও যায়?

একবার তার মনে হলো সে নিজেকে এবং তার নিজের সন্তানদিগকে কুৎসিত কিছু উৎপন্ন মনে করে কিনা। পরমুহূর্তে সে ভাবলো এই যে আজ ঈশ্বরচিন্তায় যৌনতা সংযুক্ত হয়েছে এর জন্য সে-ও কি দায়ী? হে ঈশ্বর, আমাকে এই কোন্ দুর্গন্ধ কূপে নিক্ষেপ করেছো! এ কি কঠিন পরীক্ষা তোমার? হয়তো এই সূচনা মাত্র। অথবা এ কি ঈশ্বরের অঙ্গুলিনির্দেশ যে এ গ্রাম তোমাকে ত্যাগ করতে হবে? বারবার সে কি পরাজিত হচ্ছে না?

আদর্শবাদীদের চিন্তা অনেক সময়ে কবিদের অনুপ্রেরণার মতো অতি সাধারণ কয়েকটি শব্দে গভীর তাৎপর্য ধরতে পারে। হঠাৎ যেন অনুপ্রেরণার মতো তার মনে স্ফুরিত হলো—না, না, এ কথা

আমাকে বলতেই হবে যে আশা আছে। দেওয়ানজি আধুনিক না হতে পারেন, বাগচিমশাই হয়তো প্রকৃত খ্রীষ্টান নন, শিরোমণি হয়তো বাইবেলের শয়তানদের মতো তর্কসিদ্ধ ; স্কুলের পরীক্ষার ব্যাপারে এবং চরণদাসদের নাটক অভিনয়ের বিষয়ে সে হয়তো পরাজিত, কিন্তু এই অন্ধকারে তাকে তো হাতড়ে হাতড়ে চলতে হবে। নতুবা কি ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যায় না সে? হয়তো কালে, দেওয়ানজির চাইতেও প্রবল কাউকে সহায় পাবে তাদের এই নতুন ধর্মের ক্ষেত্রে?

তা কি হয়? কেউ কি দেওয়ানজির তুলনায় এই গ্রামে বেশী শক্তিমান হতে পারেন? রাজকুমার? রানীমা?

এই গভীর দুশ্চিন্তায় ঈশ্বর যেন বা তাকে আশ্রয় দিলেন। বিদ্যুত্তাদের মতো তার মনে পড়লো তার ভগ্নী ব্রহ্মময়ীর কথা। সে কি তার চেষ্টায় সার্থক হবে? বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা কি রাজকুমারের বধূরূপে আসতে পারেন? তা যদি হয় (নিওগি মনে মনে স্থির করলো তা হওয়া দরকার), তবে কী না হতে পারে। ক্রিশ্চিয়ান নাকি বৌদ্ধধর্মে এরকম ঘটেছে যে রানী তাঁর পিতৃবংশের ধর্ম এনে প্রথমে রাজাকে পরে রাজার সব প্রজাকে খ্রীষ্টান করতে পেরেছেন। বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যার সাহায্যে এখানে নবীন ধর্মের প্রচার হতে পারে।

এই ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সে দ্রুত পদক্ষেপে চলতে লাগলো। স্থির করলো ব্রহ্মময়ীকে চিঠি দিয়ে তাকে ঘটকালির ব্যাপারে উৎসাহ দেবে।

[ক্রমশ]

কবিতার জন্মকথা, ব্যক্তিগত

লোকনাথ ভট্টাচার্য

সর্বপ্রথমে আমি বন্দনা করি দশ দিককে।

পূর্বে বন্দনা করি মানুষের দুঃখের রক্তিম দিগন্তকে; পশ্চিমে যাত্রাশেষের গোধূলিকে; উত্তরে মৃত্যুর ঈশ্বর যমরাজকে; দক্ষিণে বসন্ত-ঋতুকে।

উত্তর-পূর্বের ঈশান কোণে বন্দনা করি মাতৃরূপী কল্যাণীর দক্ষিণ স্তনকে; দক্ষিণ-পূর্বের অগ্নি কোণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞের প্রথম পদক্ষেপকে; দক্ষিণ-পশ্চিমের নৈঋ‌র্ত কোণে আমার প্রিয়ার বাম উরুকে; উত্তর-পশ্চিমের বায়ু কোণে মরুভূমির হাওয়াকে।

ঊর্ধ্বে আমার বন্দনা জগতের চক্ষু সূর্যকে; অধঃতে স্বপ্নের অবিনশ্বরতাকে।

আমি বন্দনা করি এই মহান সভার সকল সভ্যকে; যাজ্ঞা করি তাঁদের পদধূলিকে।

এইভাবে চৌকাঠ উত্তীর্ণ যখন, ধীরে-ধীরে প্রবেশ করি অন্ধকার ঘরে, পাতা আসনে বসে আগে নিশ্বাসটাকে সমান হতে দিই, পরে দেখি বসার ভঙ্গীটি যথাযথ হয়েছে কিনা, হাঁটু ও ঘাড়ের জ্যামিতিতে ভুল আছে কি নেই। তারো পরে, সময় হয়েছে অনুভব করে, নিরুদ্বেগ প্রেম ও প্রত্যয়ে প্রস্তর-মূর্তি পার্বতীর যোনিতে নিজের লিঙ্গটি ঠেকাই, প্রস্তর-মূর্তি আর প্রস্তর-মূর্তি নেই জেনেই। তারো পরে, ঘরের আনাচে-কানাচে ধুলো-ঝাড়া তাকে বা কুলুঙ্গিতে আগে থেকে যা-কিছু ছিল, এখনো রয়েছে, এবং নতুন আরো কিছু যা এসে গেছে, এবার তাদের নামকরণ করতে বসি, ওজন করে নিই কোন্ নাম কার প্রাপ্য, পরে আঙুল তুলে দেখিয়ে-দেখিয়ে একে-একে বলতে থাকি, এই তুমি হচ্ছ দুঃখ, ঐ তুমি গম্বুজ; এই তুমি গোধূলি, ঐ তুমি ময়ূর।

পরে বেরিয়ে আসি ঘর থেকে।

আমার এই খেলা যেন নিজের সঙ্গে বাজি রেখে, পূর্বনির্দিষ্ট অতি-অল্প সময়ের পরিধিতে, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এতটুকু ভুল না করে, কোথাও একবারও হোঁচট না খেয়ে, থমকে না দাঁড়িয়ে।

স্যুররেয়ালিস্তরা যাকে স্বয়ংক্রিয় লিখন বলতে চেয়েছেন, জানি না এটা কতখানি তা। অথবা এর সঙ্গে কতখানি সাদৃশ্য আছে না-আছে মহম্মদের বাণীর, বা সেণ্ট জন অব দ্য ক্রস-এর লেখার, বা আমারই দেশের প্রাচীন ঋষিদের উক্তির। তবে দুটো জিনিস জানি। এক, স্যুররেয়ালিস্তরা আমার মতো অনেকেরই তৃষ্ণার্ত চোখের সামনে একটার পর-একটা নিষিদ্ধ দরজা খুলে দিয়েছেন, যার ফলে বিচিত্র আলোর সহস্র জীবাণু আমাদের কামড়ে ধরে কাঁকড়া-বিছার মতো। দুই, যে-মুহূর্ত নিয়ে আমাদের কারবার, তা একদিকে যেমন ম্যাজিক, তেমনি অন্যদিকে অনিবার্যভাবে চিহ্নিত মিস্টিক উপাদানে, হয়তো মিস্টিক বলেই ম্যাজিক। এবং এটাও মানব, প্রথমে যখন বসি, আমি আমার মুহূর্তটির সামনে প্রস্তুতি নিয়ে মুখোমুখি, শাশ্বতীর সেই দুটি নায়ক-নায়িকা আমরা দুজন, তখন যদিও নিজের ইচ্ছা ও ক্ষমতা সম্বন্ধে পুরোপুরি সজাগ থাকি, জানি কোন্ মালমশলা নিয়ে কোন্ যজ্ঞ করতে চলেছি, তবু মাঝামাঝি এগিয়েছি কি বেশ দেখতে পাই যে গতি আমার আয়ত্তের মধ্যে আর নেই, পৌঁছে

যাচ্ছি অচেনা এক অন্য জগতে, অন্য এক মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির কবলে। তখন আমার শিরায়-ধমনীতে বাজতে থাকে কোন্ পূজার কাঁসরঘণ্টা, আত্মসমর্পণের ভৈরবী রাগিণী।

নিজের এত কথা বলা পাপ, আমার মতো অকৃতার্থের পক্ষে ধৃষ্টতা, তবু যেহেতু আমি ও আমার প্রস্তুতির ক্ষণের প্রসঙ্গ ইতিমধ্যে পেড়েছি, বলেছি এরা দুটি নায়ক-নায়িকা, এটাও তাই বলতে হয় যে আমার সেই ক্ষণটিকে দেখি এক নারীর মতো করে—একটি নারীই বটে, সুন্দরীদের রানী ও নগ্না, সুডৌল স্তনের মহিমা যার ছুয়ো দিতে পারে যে-কোনো রম্ভা-উর্বশীকে ও যাকে ঘরে ঢোকার পর যথার্থ মুহূর্তটি এলে দেখি আরামকেদারায় উপবিষ্টা, আপনাতে আপনি মগ্না, হাঁটু দুটি ফাঁক করে অপেক্ষা তার আমাকে নিয়ে শয্যায় উঠে যেতে। আমি জানি, আমার পক্ষে তাকে সম্পূর্ণ করে পাওয়া মানেই তাকে খুন করা, আমার লুক্কায়িত ছুরিতে হঠাৎ বিদীর্ণ করা তার পুষ্পের মতো শুভ্র বক্ষ, যাতে সময় উত্তীর্ণ হলে জানালা বা দরজা বা ঘরের অন্য কোনো ফাঁক দিয়ে সে বেরিয়ে যেতে না পারে, কোনো ভবিষ্যের দিকে-দিগন্তে অন্য কারুর সঙ্গে সঙ্গমে আবার তার হিরণ্ময় বীজ না ছড়ায়, যাতে তার ও আমার লগ্ন চিরকালের জন্য খোদিত হয় নিরুপম ভাস্কর্যে। আমি তাই অতি সন্তর্পণে এগোই, তাকে ঘুণাক্ষরেও জানতে দিই না আমার ভাবটি, যা কর্তব্য তা করি, পরে খুনের সেই মোক্ষম কার্যটি সমাধা হলেই ফিনকি দিয়ে যে-রক্ত ছোটে, যে-আঙুর-পেষা সেই রস, ও তার সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের কোনায়-কোনায় দেয়ালে-দেয়ালে যে-অজস্র হুলুধ্বনি-ঢাকবাদ্যি বেজে ওঠে, তা-ই হয় সেই প্রার্থিত উচ্চারণ, বা কবিতা, অর্থাৎ নাম যদি দিতেই হয় কোনো।

আমার স্পর্ধার জন্য আগে থেকে ক্ষমা চেয়ে এবার অন্য একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করছি। কিছুকাল ধরে কেবলি আমার মনে হচ্ছে, আমি বোধহয় আমার সীমিত জীবনের পক্ষে এক ভয়াবহ আবিষ্কারের দিকে ছুটে চলেছি। সে-আবিষ্কার ভাষা নিয়ে মেতে থাকতে-থাকতে একেবারে ভাষারই চৌকাঠ পেরিয়ে যাওয়ার। যেখানে আমার চেনা ভাষা বা আমার ভাষার সমগ্র শব্দভাণ্ডার আর পারছে না, হার মানছে, সেখানেই আমার এই নবজন্ম ঘটছে। মনে হয়, এই সুযোগ বা দুর্যোগটাকে ঘটানোর একটা নিশ্চিত উপায়ও যেন খুঁজে পেতে চলেছি, এবং সেই উপায়টি হল এই। যে-ম্যাজিক মুহূর্ত নিয়ে আমাদের কারবার, যার সঙ্গে আমাদের যোগের স্থিতিকাল অতীব ক্ষণস্থায়ী হতে বাধ্য, ধরা যাক আমি সেটার উপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে চাইলাম, যতটা পারলাম সেটাকে টেনে বাড়াতে শুরু করলাম। যেন একটা অতি-সাধারণ রবারের বেলুন, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে যা নিয়ে খেলা করে, ধরা যাক তেমন একটা বেলুনকে ফুঁ দিয়ে ফোলাতে শুরু করলাম, ফোলাচ্ছি ফোলাচ্ছি সমানে ফুলিয়ে চলেছি, শেষে সেটা যখন প্রায় ফাটে-ফাটে, স্পষ্ট দেখছি তার সর্বাঙ্গে আর্ত-স্ফীত-জর্জরিত শিরা-উপশিরার নীল বিদ্যুৎ ককিয়ে কাঁদতে চাইছে, ঠিক সেই মুহূর্তে ক্ষান্ত হলাম, তার মুখটি সযত্নে বাঁধলাম সূক্ষ্ম অথচ দৃঢ় এক সুতো দিয়ে। তারপর সেই অনন্ত দুঃখের আলেখ্যটিকে, সেই ভাষা ও ভাষাহীন ভাষার স্পন্দিত আর্তনাদকে সামনে রেখে ধন্য ভক্তের মতো নতজানু হলাম, নামাজ পড়তে শুরু করলাম।

শেষে আরো একবার সকলকে নমস্কার করে আমার সেই বাংলা ভাষায় কসরতের দুটি-একটি সামান্য নমুনা এখানে দিচ্ছি।

মেঘের বাচ্চা

হাওয়া আজ বইতেই দেব বলে সিদ্ধান্ত নিই, এবং সে-সংকল্পে এখনো অটল আছি, যখন যথারীতি ঘরে ঢুকি, চিন্তামগ্ন, মাথাটা নিচু, হাত-দুটো পাছার একটু উপরে এনে ভাঁজ করা, এ-আঙুলে ও-আঙুল সৌহার্দ্যে বন্দী—আর ঘরে পা দেওয়া মাত্র প্রতিবারেরই মতো বোঁ করে একবার পরখ করে নেওয়া ছবি-টবি ঠিকঠাক টাঙানো আছে কিনা, নাসারন্ধ্রে পাচ্ছি কিনা ধুলোর গন্ধ, না, সব

যথাযথ, শুনেছি আজও আসছে মুহূর্ত ঘোড়ায় চড়ে, আকাশের আঙিনা দপদপ কাঁপে খুরে-খুরের আওয়াজে, অর্থাৎ প্রতীক্ষা ভিন্ন আমার কিছু করার নেই ও তাই তৃপ্ত চোখে তোমার দিকে তাকানো, যে-তুমি শিল্পীর স্বপ্ন হয়ে ফ্রেমে-আঁটা আলেখ্যের মতো পালঙ্কে অর্ধশায়িতা, নগ্না, দেখি তোমারও চোখে আসন্ন অভিজ্ঞতার

শিহরণ ঝিলিমিলি তুলতে শুরু করেছে এখনই, যেন ছায়ানিবিড় বাঁশঝাড়-পাড়ে-ঢাকা গ্রামের পুকুরে হঠাৎ এক-কণা সূর্য যখন

তীর শান্ত বন শান্ত গ্রাম তখনো ঘুমোচ্ছে, স্তন অন্ধকারের পাহাড়, উরু-দুটি জনহীন রাজপথ রূপালি পাতের মতো এগোতে-এগোতে-এগোতে পৌঁছে যায় খোদ মণিকোঠার দরজায় ও যে-দরজার এধারে-ওধারের গুল্মে শিশিরের সৌরভ, শুধু

তোমার অন্তরীক্ষ কাঁপিয়ে ভোরের প্রথম মোরগটিই ডেকে উঠেছে একবার কোঁকর-কোঁ কোঁকর-কোঁ, পরেই মিলিয়ে গেছে স্নায়ুর অলিগলিতে ব্যাপ্ত করে তার তীব্র নিখাদের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি, তারো পরে উদাত্তে মন্দ্রিত-মূর্ছিত হতে-হতে কী করে নীরবতা আপন অসহ্য ঐক্যেরই ভারে চুরমার ভেঙে পড়ে ভূমিকম্পে সাতমহল এক প্রাসাদের মতো, খসে পড়ে একটি একটি করে

ঘর, খিলান হতে খিলান, অলিন্দ থেকে অলিন্দ, তোমার নাড়ীতে হিসহিস করে সাপ এবং তখন কী করে আমাতেও খেলে যায় বিদ্যুৎ এক যুগপৎ সাধের একদিকে হঠাৎ ক্যাঁক করে গলা টিপে মারতে উদ্ভাসিত-ঠোঁটের কোন্ ক্রীড়ারত শিশুকে অন্যদিকে সমানই উন্মাদনায় গর্ভবতী করতে অগণ্য রাত্রির ঈশ্বরীদের, ইত্যাদি-ইত্যাদির আজ এই অনুভূতিগুলির রূপ ও

ক্রমকে আমি সাজাই ও মিলাই অনুরূপ সেই চির-প্রস্ফুটিত অতীতের যমজ স্মৃতিগুলির পাশে রেখে, দাঁড়িপাল্লায় ওজন আজকের পরম্পরার সঙ্গে আগের গুলির, একটি খোপের সঙ্গে আরেকটি

খোপের, কথার মৃত্যুর সঙ্গে অন্য কথার জন্ম-যন্ত্রণার, এক পাল্লায় জলে-যাওয়া গোধূলি অন্য পাল্লায়

ময়ূর-নাচা সূর্যোদয়, একে স্বপ্ন অন্তে উঁচানো বল্লম স্বপ্নহননের, দেখি সর্বত্রই চুলচেরা সামঞ্জস্য নির্ভুল জ্যামিতি, ষড়্‌জ মেলাচ্ছি নিটোল ষড়্‌জে, অর্থাৎ প্রস্তুতিতে খাদ কোথাও

নেই-নেই বলেই ভক্ত অনুচরের মতো করযোড়ে অপেক্ষমান তোমার উক্ত ঘরের দেয়াল ভোরের মোরগ, আসছে-আসছে-আসছে, তাই আমার আরো একটি উদ্যত পদক্ষেপ···ব্যস, যথেষ্ট, ঐ

উদ্যত পদক্ষেপেই আজকের মতো ছেদ টানছি যাত্রার—কারণ যে-পা হাঁটছে সেটা তো আমারই, অন্যের নয়—থামিয়ে দিচ্ছি আমার সেই মুহূর্তের আগুয়ান বেগ যা এখনো ছুটন্ত টাট্টু আকাশে-আকাশে, পালঙ্কে শায়িতা তোমারই মতন করে তাকেও এই হঠাৎ করছি ভাস্কর্য, তারপর, নিয়মকানুনে

ভুলচুক যেহেতু কখনো করি না, নিজের পেশাটা নখদর্পণে, তাই উনুনকে জ্বলতে দিয়ে, তোমার ইচ্ছাকে চিরজীবী করে রেখে আজ আমি পা টিপে-টিপে বা নাচতে-নাচতে নিজেকে দেখতে-দেখতে দেখাতে-দেখাতে টুক-টাকাম-কাম-ড্যাড্যাং-ড্যাং ড্যাড্যাং-ড্যাং করে ঐ ঠিক যেমনটি ঢুকেছিলাম তেমনটি বেরিয়ে যাব ঘর থেকে যখন

বাইরেও ঘোর ধীরে ধীরে কাটছে, কোলাহল একটু-একটু জাগছে, চড়ুই-শালিকের কিচিরমিচিরও,

শীতের মাটী হতে গ্রামের দুঃখের ভাপ মেঘের বাচ্চার মতো লাল-নীল বাষ্প হয়ে সবে শুরু করছে চেষ্টা শূন্যে ওঠার, উঠছে, থেমে যাচ্ছে, আবার

একটু উঠছে।

গুম্ফা ও জনৈক লোকনাথ

গৌরচন্দ্রিকা নয়, কারণ এ-কীর্তনের হে অধীশ্বর দেবতা কে-কোথায় আছো, তোমরা রক্ষা না করো যদি আমায় মিথ্যা হতে, দুঃখ নয় দুঃখকে নিয়ে আমার বেশ্যাবৃত্তি হতে, স্বপ্ন নয় স্বপ্নের রাংতা হতে—আমায় রক্ষা না করো যদি সারা-গায়ে তুচ্ছতার থুথু-মাখা কাপড় বা কপটতার হোক-না কিংখাবই হতে, যে-আমি আজকালকার সকালে-সন্ধ্যায় সাতচল্লিশ বছরের জনৈক লোকনাথ ভট্টাচার্য বই নই, সব সাধারণ সমবয়সীদের মতোই একদিন দাড়ি না কামালে গাল সাদা বা একই যাত্রায় যার তুবড়ানো-চুপসানো বাক্স-পেঁটরা অন্যান্যদেরই মতো গ্রামের ধূমায়িত মধ্যাহ্নে তোলে ঠুংঠাং সস্তা আওয়াজ চলমান হাঁটুর ছন্দে, তবু ত্যাখো আস্ফালনের হাত-পা গজানো যার কত দিকে-দিকে, নিশ্বাসে

দুন্দুভি, নিজেকে ভাবছি সূর্যাস্তের আস্কারা-পাওয়া নবাব—রক্ষা না করো যদি তো নিশ্চয় জেনো আমিও নই কম বেপরোয়া, মুখগুলো ঠিক রয়েছে কোথায় না দেখতে পেলেও ছুঁড়ে দেব এই নৈবেদ্যের সাজানো থালি তোমাদেরই মুখে, এই তণ্ডুলের সযত্ন বিন্যাস আগ্নেয়গিরির আকারে ও গিরির জ্বালামুখ-চূড়ায় নারকেল-নাড়ু, সজোরে নিক্ষেপ করব ধুলায় যা রূপার রেকাবিতে করে তোমরাই তুলে এনে দিলে—কেন দিলে ?—এই মণি-মাণিক্যে খচিত ক্ষণ। হ্যাঁ-হ্যাঁ ভনিতা নয় বা একটু আগের কী-যেন সেই গাল-ভরা বিশেষ্যপদটা—গৌরচন্দ্রিকা ?—তাও নয়, বরং প্রস্তাব-অভিলাষ-সিদ্ধান্ত যা-ই বলো ও সেই জাতীয় আরো কী-কী কথা আছে বা খুঁজলে পাওয়া যেতে পারে আমারই রং-চটে-যাওয়া মলাটের অভিধানে, ঐ যেটা এখুনি আবার হাতড়ে বার করে ওল্টানো-পাল্টানোর সাধ বা সাহস নেই কিন্তু কে-না জানে যার পাতায়-পাতায় গন্ধ কত-না ইঁদুরের পেচ্ছাবের, দাঁতের কামড় পোকামাকড়ের ও বিশেষত সংকল্প বলে যে-আরো একটা কথা, হ্যাঁ-হ্যাঁ ঐ অভিধানেরই এবং সেটাই হবে হয়তো সবচেয়ে উপযোগী, সেই সঙ্কল্পটা আমার সরাসরি আরম্ভেরই—তবু সেখানেও, যেমন অন্যত্র, আগে চাই তোমাদের ক্ষমা, কারুণ্যের বৃষ্টির দৃষ্টি, বলে দাও কী-মন্ত্র কেমনভাবে উচ্চারণ করতে হবে, কোন্ স্বর শব্দে-শব্দে, রণন-দ্যোতনা-মূর্ছনা, কোথায় নিশ্বাস নেওয়া-না-নেওয়ার নিয়মকানুন। ব্যস, হল আরম্ভ, ততটা আমার জন্যে নয়—আসলে একেবারেই নয়, সাক্ষী এ-পৃথিবীর আজো-কুমারী সততা--যতটা তোমাদেরই ধাক্কার দরুন বা হে দয়া-ক্ষমা-আশীর্বাদ, ভুলের অবকাশ যেহেতু এখানেও, ভয় মিথ্যা-বাচনের, তাই সম্ভাব্য সকল জানা-অজানা স্থানে যথোচিত গড়ের সঙ্গে স্বীকার যে পিছন হতে এল বলেই দেখিনি ধাক্কাটা কার, কারুরই ভ্রূ-কুঞ্চিত কপাল বা দাঁতে-দাঁত-ঘষা মুখ, শুনিনি শ্লেষের-ব্যঙ্গের কোনো অট্টহাসিও, তবু আমারই পিঠে ও পাছায় দমকা হাওয়ার মতো কিছু একটা লাথি তো বটেই, যার ফলে চৌকাঠের বাইরে ছিলাম, এবার পড়ছি হুড়মুড় করে ঘরে, যখন কোমরটা ভাঙল কিনা বুঝতে চাওয়ারও আগে সশব্দে দরজা বন্ধ—হঠাৎ, সেই অলক্ষ্য হাতে। মানছি পরিচিত. ঘর, আগে অনেকবার এসেছিও, চিনি যেন দেয়ালের ভিতরের ইট-সুরকিগুলোকে পর্যন্ত, জানি কোন্ ভাষায় চলে তাদের ইনিবিনি ফিসফাসের প্রণয় দিনরাত্রি ধরে বা কোন্ বিস্ফোরণের বিকট আকাঙ্ক্ষায় তারাও ফেটে পড়তে চায় এক কালবৈশাখীতে--খোলা চোখে দেখার মতো যা-কিছু তা তো এতই মুখস্থ যে চোখ বন্ধ করেও ফিরিস্তি শুরু করা যায় পাঠশালায় শেখা নামতার মতো এককে এক দুয়েকে দুই তিনেকে তিন, একে চন্দ্র দুয়ে পক্ষ তিনে নেত্র চারি বেদ, অর্থাৎ ঘরের খুঁটিনাটি এই যেমন ঢুকেই বাঁ-হাতে একটু দূরে কোণ ও যেখান থেকে অন্য দেয়াল বা সেই দেয়ালেরও মাঝামাঝি আলমারিটা, তাতে কতগুলো তাক ও কোন্ তাকে কী আছে-না-আছে, যথা দ্বিতীয়টিতে নিশ্চয় রাসের মেলায় কেনা বৌঠাকরুণটি, সাবেকী কপালে-টিপ লালপেড়ে-শাড়ি মাছের-মতো-চোখ, বা কাঠের সে-পুতুলের উপর সকাল কিম্বা দুপুর অথবা বিকালের ঘড়ির কাঁটা বুঝে কীরকম আলো পড়ে-না-পড়ে, বা কবে কখন সেই আলো দেখে দেবদূতোপম কোন্ শিশুর মৃত্যুর স্মৃতি আমাতে জেগেছে-না-জেগেছে ও তখন জ্ঞাত-অজ্ঞাত সকলের জন্য অনন্ত জীবন চেয়ে কী-প্রার্থনা করতে আমি বসেছি নতজানু, ইত্যাদি-ইত্যাদি, মানে অন্য খুঁটিনাটিতে যদি না-ই যাই, এবং যেতে চাইবই বা কেন যেহেতু কী-দরকার আমার সম্পূর্ণ পর কোনো ব্যক্তিকে বা না-হয় হোক-না কোনো আকাশকেও-বাতাসকেও বোঝানো-পড়ানো

যে এটা চিনি আমি ওটা চিনি আমি সেটা চিনি। আসলে ফিরিস্তিটা নিজেরই জন্যে, আওড়ে পাই সান্ত্বনা যে ঘর যেহেতু নখদর্পণে, তার ছয় ঋতু চিনি দশ দিক চিনি মৈথুন চিনি মৃত্যুর স্বপ্ন চিনি, তাই ঢুকে যদিও পড়েছি অন্যেরি ধাক্কায়, আশপাশকে আবার আপন করে নিতে কতক্ষণ, কতটুকু ক্ষণ এই হাঁপানোর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে, বুকের বর্তমান দুরুদুরুটা থামাতে, তারপর প্রস্তুত হতে—প্রস্তুত, প্রস্তুত হতে—এবং সেটা একবার হলেই ভয়টা কোথায়, কারণ দানবীও কেউ যদি থাকে আমায় খাবলে-খাবলে খাওয়ার তো সে-দানবীটাকেও যে হায় আগে থেকে অতি-আগে থেকে চিনি! এবং প্রসঙ্গটা যেহেতু ইতিমধ্যেই উত্থাপিত, বলেই ফেলি দানবী সত্যিই আছে, হ্যাঁ-হ্যাঁ এই ঘরেই এবং আমার এই সাতচল্লিশ বছরেও, আসলে আমার রক্ত-লিঙ্গ-নাসারন্ধ্রের প্রতি লেলিহান রুচি তার ততই বাড়ে যত, আশ্চর্য, আমিও বয়সে বাড়ি, নিজের দুঃখটাকে সম্বিৎ হারাতে দেখি হঠাৎ দিগন্তহীন সকল মানুষের দুঃখের মোহানায়—ও তখন সেই মোহানার বহুদূর অদৃশ্য পারের বনরাজিনীলায় যে-একটি আকুল অপার্থিব অন্ধকার নামে, যার ঠিকানার আভাসে আমার স্নায়ুর অলিগলি চঞ্চল, জানি-জানি ঐ রাক্ষুসী কাজল পরতে চায় সেই অন্ধকারের, সর্বাগ্রেই, পরেই তার যথার্থ যজ্ঞারম্ভ। তবু এখনো দেখছি না তাকে, কারণ দেখতে চাই না, কারণ মন্ত্র বাজেনি, তাই এড়াতে চাওয়ারই কসরৎ আপাতত, অন্তত যতক্ষণ পারা যায়, ও ততক্ষণ ভুলিয়ে রাখার বা সঙ্গ দেওয়ার মতো এ-ঘরের এটা-ওটা-অন্য অনেক কিছু তো আছে, এবং এই তো চোখ পড়ল থালাটার উপর, ঐ যেটা দেয়ালে টাঙানো, তিব্বতীই বটে, গোল চাকতিতে এতটুকু না নড়েও বন্-বন্ নাচায় নিথর নীরন্ধ্র নীরবতার নাড়ী-ভুঁড়ি-পাকস্থলী, আর সঙ্গে-সঙ্গে আমিও মনে-মনে বলি তোফা-তোফা, পাওয়া গেল, কারণ গুমরে-গুমরে-ওঠা রাত্রির কোন্ অবোধ্য গর্জনের মতো ঐ-তো বিলাপ কতদূর থেকে ভেসে-আসা মঠের, লামাদের, যাদের জোব্বায় লুকানো হাহাকার আঁৎকে তুলতে পারে সকল রক্তিম ঊষাকে, যদিও সে-হাহাকার আমি কেন ভাবতে বসতে যাব আবার যে-মুহূর্তে আমার সবচেয়ে দরকার নয় কি কিছু মনোরম অনুভবেরই, সুখাদ্যের স্মৃতির, রস বা রসনার অতীত অভিজ্ঞতার, যাকে ইচ্ছামতো জাঁইয়ে তুলে আবার চাখা চলতে পারে, চাইলে মধুর কোনো দুধপুলির মতো জিভ দিয়ে কেন চাটা-ই বা চলবে না, তাই প্রসঙ্গে যখন আছিই তখন ঐ লামারই মতো বলা যাক ওঁ মণিপদ্মে হুম্ ও বলেই দৌড় তিব্বতী থালা হতে এ-দেয়ালের আকাশটা চষে বেড়াতে, বার করতে অন্য কোনো সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র, হয়তো ছবিই একটা কি ছবিহীন পেরেক মাত্র—হ্যাঁ-হ্যাঁ এমন একটা পেরেক যেন ছিল, নিশ্চয়ই আছে, ঢোকার মুখে ডান-দিকে হাত-চারেক দূরে—এবং যে-পেরেকে লটকানো চলে হয় এখুনি-এখুনি সাজিয়ে-গুছিয়ে তোলা কোনো গোধূলি, নয় তিনদিন আগের দেখা গম্বুজ, কিম্বা হোক-না দূর শৈশবেরই একটা বাঁদরনাচের ঘটনা, কৌতুকের, হাততালির, অর্থাৎ এমন একটা কিছু যা লাল-নীল রঙ-চঙ মাখিয়ে খাড়া করা চলে, এধারে-ওধারে একটু টক বা তিক্ত হলে আছেই তো চিনির শরবতের রসায়ন, ধার কোথাও মসৃণ না থাকলে আছে ছুতোর মিস্ত্রীর অস্ত্রও। কিন্তু হায় আপাতত দেখছি ঐ লামাটাই হচ্ছে নাছোড়বান্দা, আমি যত ঘুরি, ও ঘোরে আমার পিছনে, তারপর উরিঃ সাবাস দাদা-রে-দাদা কী সাংঘাতিক দৌড়োদৌড়ি যে আরম্ভ হল, আমাদের পায়ের দপ্-দপ্ শব্দে কাঁপে দেয়ালের মেঝে বা মেঝের দেয়াল—ধুম-ধাড়াকা-ধাড়া-ধাড়া-ধুম—যদিও খেলা এটা

একেবারেই নয় যেহেতু অন্তত আমার ক্ষেত্রে নিছক প্রাণপণ পলায়ন, আবার বুকের দুরদুর আবার হাঁপানো, এবং ও-হতভাগার চোখ ক্রমশই আরো কটমটে, হাতের মুঠো দুটো আরো শক্ত, অর্থাৎ যখন দুজনে থেমেছি, সামনাসামনি পড়ে গেছি, ও স্থির করছে কী করে ঝাঁপিয়ে পড়া যায়, ঝাঁপ দিলেই এড়াবো কী করে ভেবে আমি দেখছি চোখে অন্ধকার—অবশেষে ছুটতে-ছুটতে-ছুটতে জানি না কখন হঠাৎই ওর আওতার বাইরে চলে এলাম, বেচারা পারল না ঐ পায়ে-পায়ে কেবলই আটকে যাওয়া ওর পেল্লায় জোব্বাটারই কারণে, হয়তো পড়েই গেছে খালে-নালায় চিৎপটাং এবং আবার উঠতে পারার আগে আমি দে-ছুট দে-ছুট দে-ছুট গোধূলিকে ধাক্কা মেরে গম্বুজের পাশ দিয়ে বাঁদরনাচ টপকে এ-দেয়াল-মেঝের আকাশে-আকাশে তুলে বুনো মোষের মতো ধুলোর সরগরম মেঘ, যখন বলা বাহুল্য এমন আহাম্মক নই যে পিছনে ফিরে দেখতে চাইব ও কী করছে-না-করছে, দম নিচ্ছে না অবশেষে কোঁচা বাঁধছে এবং যদি কোঁচা বাঁধতেই চায় তো জোব্বার আঁটসাঁট মোটা কাপড়টা সে-কাজে কী করে সহায় হবে বা এখনো দেখা একেবারেই যাচ্ছে কিনা লামাকে, না মিলিয়ে গেছে ঘূর্ণিঝড়ে—দূর-দূর-দূর এসব দেখতে চাইছে কে, শুধু ছোটা ছোটা আর ছোটা, ছুটতে-ছুটতে-ছুটতে অবশেষে ফেরা যাত্রার প্রথম বিন্দুটিতে, অর্থাৎ এবারকারেরই, অর্থাৎ তিব্বতী থালায়, এবং সঙ্গে-সঙ্গে আবার ভয় পাছে পূর্বেকার মতোই থালা হতে লামা এসে এই বুঝি হাজির হয়। হল না—হে আশীর্বাদ, ধ্বনিত হোক জয় প্রাণদাতার—এল অন্য এক রাত্রি, ঐ থালারই সূত্র ধরে, এবং রাত্রির সঙ্গে-সঙ্গে পাড়াপড়শি কত বন্ধুজন যারা সারা-গ্রাম উজাড় করে সেদিন এসেছে আমার জানালায়, এবং হ্যাঁ, ঘরটাও তো এইটেই ছিল, এই তো সেই জানালা, একটু এগোলেই পরখও করে নেওয়া চলে, যে-প্রশ্ন অবশ্য ওঠেই না, কারণ এগোতে গেলেই এবার আর লামার নয়, অন্য সেই কবল, একেবারে মোক্ষমটি, যা এখনো এড়াতে চাই—যাক, না এগিয়েই, এমন-কি চোখটাও না খুলেই পরখ করা চলে জানালাটাকে, বা জানালার ঠিক তলা দিয়ে চলে গেছে যে-মেঠো পথটা বা পথেরও ওপারে রয়েছে যে-বটগাছটা, জানালায় জায়গা হয়নি বলেই যার বেদীতে ওদেরই কেউ-কেউ বসেছিল সেদিন, মেনে নেওয়া চলে যে এই সবই যেমনটি ছিল আজো ঠিক-ঠিক আছে। সে-রাত্রের রঙ চুরি করেছিল তিব্বতী থালা বা থালারই গাঢ় বেগনি মাখে বাইরের নিশীথিনী, স্তব্ধতার কাপড় মুড়ি দিয়ে গাছপালা-নিসর্গ হাঁটু ভাঁজ করে বসেছে তেমনি যেমন ঘরে আমিও বসে আসনপিঁড়ি, কোল-বেয়ে-নেমে-আসা আমার হাতটি আলতোভাবে মাটিতে ছোঁওয়ায় নিখুঁত জ্যামিতি, আর সে-কী আকুল নিশ্বাস-রুদ্ধ-করা দৃষ্টির সারি জানালায়, ঐটুকু জায়গায় গাদাগাদি পঁচিশটা কি তিরিশটা মাথা কম করে, একটার উপরে আরেকটা, কেউ-কেউ নিশ্চয় উঁকি মারার মতো ফাঁকটি পাওয়ার জন্য নিজেদের শরীরের থেকে আরো লম্বা হয়েছিল, হয় মাটির তলায় ইঁট রেখে নয় অন্যের ঘাড়ে বা কোমরে চেপে, গবাদ ভর্তি শুধু আঙুল-আঙুলের সর্পিল বিচিত্র মাধবীলতায়; যদিও সে-সবের আমি কিছুই দেখিনি, না তাদের মাথা না আঙুল, দেখিনি নিশ্চয় হাড়-জিরজিরে বুড়ো বা গালে-টোপ-খাওয়া কিশোরীদের সেই অন্য অনেককেও যারাও জানি ভিড় করেছে কিন্তু যাদের দেখা মিলতে পারে যদি টপকানো চলে জানালার ঐ সারি-সারি মাথা—যেটা বলাবাহুল্য গ্রাহ্যের বাইরে যেহেতু ফাঁক নেই এতটুকু নেই—তারপর জানালা পেরিয়ে পৌঁছনো চলে পথে বা পথের ওপারে বটের বেদীতে, যেখানেও সর্বত্রই গিজগিজে

লোক ও এত নিশ্বাস এত প্রতীক্ষায় হাওয়ায় আগুন, গমগমে মুহূর্ত, এবং না দেখেও জানি কী-অনন্ত কান্নার কারুশিল্প সেই সব মুখে, বৈশাখী সন্ধ্যায় পুঞ্জীভূত মেঘের মতো কী-উত্তেজনা তখনো শুধু ভাস্কর্যই করে রেখেছে তাদের চোয়াল-চিবুকের ঠেলে-ঠেলে-ওঠা চূড়াগুলো, গালের উপত্যকায় বিষাদের কী-শ্বাপদসংকুল অরণ্য সেই, তাই গিলে-খাওয়া-চোখে আমায় দেখছে যেন আমিই এনে দেব তাদের সাত-রাজার-ধন-এক-মানিক, এবং এনে যেটা আমি দেবই, অন্তত দেওয়ারই প্রতিশ্রুতি নিয়ে বসেছি তো ঘরে। না দেখেও যা দেখছি যদি বললাম তো বলব না কেন নীরবতার সেই গলা-টেপা ক্ষণে না শুনেও যা শুনেছি, কারণ বেশ তো দেখতে পাচ্ছি—পাচ্ছি না?—মুখ বন্ধ করেও চেঁচাচ্ছে ওরা, কেউ-কেউ ঠোঁটের দুদিকে আঙুল ঢুকিয়ে শিসও দিচ্ছে, অনেকটা গ্রাম্য মঞ্চে পুষ্ট দেহের পাছা-দোলানো নর্তকী দেখলে চ্যাংড়াগুলো যেমন করে, আমায় উৎসাহ দিয়ে বলছে কেউ-বা হেঁইও-হো হেঁইও-হো হেঁইও-হো অথবা জোরসে জোরসে জোরসে, হেই-হেই-হেই আরো-জোরে আরো-জোরে আরো-জোরে, সাবাস-সাবাস-সাবাস, লোকনাথ-লোকনাথ-লোকনাথ, এবং তালে-তালে তো নিশ্চয় চলছেই হাততালি, যেন দশ হাজার দর্শকের এক ক্রীড়াঙ্গন যেখানে দুই পক্ষ যুদ্ধ করে মরছে, অথবা দৌড়-প্রতিযোগিতায় গ্রামের হয়ে আমিই নাম লিখিয়েছি ও আমাকে ওরা জেতাবেই, তাই ছুটছি-ছুটছি-ছুটছি, এখনো মনে তো হচ্ছে এগিয়েই রয়েছি তবু কী করে বলি শেষ পর্যন্ত কী হয়-না-হয় কারণ প্রতিদ্বন্দ্বীরাও দাঁতে দাঁত চেপে সমানই ধাবমান পাশে-পিছনে-সর্বত্র, এই বুঝি ধরে ফেলল বলে কেউ, অমনি আমিও আরো একটু জোরে বুকটা আরো একটু সামনে ঠেলে দৌড় দে-দৌড় দে-দৌড়। কিন্তু কেন দৌড়, ছুটছি কোথায়, কাকে হারাতে? মনে হতেই, ঐ চোখ বুঁজেই, যেই পিছনে তাকানো, দেখি প্রতিযোগিতায় নেমেছে আমার সঙ্গে আমার দুঃখ আমার গোটা গ্রামের দুঃখ আমার-আমাদের সকলের দিনরাত্রির হাহাকার, এক জগদ্দল পাথর এবং সে-ও ছুটছে, এবং এই আমায় ধরে ফেলল বলে, আর ধরে ফেলা মানেই আমায় পিষে ফেলা আমার মুখটা গোবরে থেঁৎলে দেওয়া, আমার ও আমাদের স্বপ্নগুলো নিয়ে তার বাটনা বাটা, পরে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে আমাকে হৈ-হৈ করে তার চলে যাওয়া, ঐ গেল বলে, দিকদিগন্ত-কাঁপানো শব্দে—আরে-আরে ধরল, ঐ ধরে ফেলল যে! এই ছাখো, সর্বনাশ, এ-কী চিন্তা আবার-আবার, কারণ এক ছোটা হতে পালিয়ে তবে কি আরেক ছোটায় আমি পৌছলাম আজ, লামা হতে দৌড়-প্রতিযোগিতায়—এক হতে অন্যে কেবলি নিশ্বাস হারানো, প্রশান্তির হনন, শিয়রে মৃত্যুর খড়্গ? ধুত্তেরি-তার-নিকুচি-করেছে, আসলে যত গণ্ডগোল ঐ তিব্বতী থালাটাতেই, মনে রাখব আজ যা নাস্তানাবুদ করল, অতএব এখুনি-এখুনি যদি চোখ না চালাই অন্য দিকে, বার করতে না পারি দুম করে লাফিয়ে ঢুকে পড়ার আরেকটি মনের মতো খোপ বা পেরেকে টাঙানোর ছবি, তো শ্রেয় কি হবে না দানবীরই কোলে ঢলে পড়া, এবার স্বেচ্ছায় বীরোচিত আত্মসমর্পণ, ঐ যে-নারীকে এড়াতে চেয়েই এই সাত-কাণ্ড রামায়ণ? যেই না মনে হওয়া, অমনি গায়ে বইল মধুবাত, জননেন্দ্রিয়ে চাপ, ওঁ মন্ত্র ওঁ মন্ত্র ওঁ মন্ত্র যা এখনো নেই, তবু এই ছাখো ঘাড় ফেরাচ্ছি আস্তে-আস্তে, মেঝের মুহূর্তে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি হাঁটুর উপর এসে-বসা গুবরে পোকাটাকে অর্থাৎ লামার ও দৌড়-প্রতিযোগী লোকনাথের ঐ দম বন্ধ-হয়ে আসাটাকে, পেরিয়ে প্রায় গেলাম বলে দেয়ালের গোটা আকাশটাকেই, যেখানে তিব্বতী থালা বা ছবিহীন পেরেকের মতো জানি আরো কত গ্রহ-উপগ্রহ

যে-যার নিজের কক্ষচক্রে ঘোরে, এখনো ঘুরছে, বন্‌-বন্‌-বন্‌-বন্‌, অপার অন্ধকারে আওয়াজ শোঁ-শোঁ-শোঁ-শোঁ, এবং গায়ে হাওয়া-লাগা আমার এগোনোর এই সময় যাদেরও স্তম্ভিত দৃষ্টি চাইতে-চাইতে চলতে হবে, পথের প্রতিটি পাথরের ঢিবিতেই একবারটি করে মাথা নোওয়ানো, পরে ঘাড় বেঁকাতে-বেঁকাতে আরো-একটু দূর, আরো দূর, আরো দূর, অবশেষে ঐ-তো পৌঁছে যাচ্ছি পদ্মের পাপড়ির মতো পায়ের চেটোয়, যদিও জানি সব বিশেষণ ও উপমা এতক্ষণে কাঁধে অনাবশ্যক বোঝা, সব কাপড় অসহ্য বন্ধন, নিংড়ে-নিংড়ে নিঃশেষে মুছতে হবে সকল ভাবও, বর্ণনার প্রতি যত খেলো আসক্তি আমার, এবং পায়ের চেটো তো শুধু ফটকের সান্ত্রী ভিন্ন নয় ও যাকে পেরোলেই যথার্থ পুরীর চৌহদ্দিতে প্রবেশ, আগে ডাইনে-বাঁয়ে বাগান কত ফুল-ফলের গাছের-পাতার, মাঝখান দিয়ে হাঁটু পর্যন্ত সোনালি রাস্তা চলে গেছে মসৃণ তলোয়ার যেখানে এখনো পিছলানো চলবে না রক্ত ঝরাতে, পরেই খাড়াই, সিঁড়ি, আরো পরে দরজা বসবার ঘরে ঢোকার, চোখ তুলে তাকানো ছাদের ঝাড়লণ্ঠনের দিকে, পরে ঘরেরও মধ্যে ঘর, ছবি-টাঙানো একটার-পর-একটা অলিন্দ, অবশেষে খোদ মণিকোঠার গুম্ফা এবং যেখানেই রাক্ষুসীর সেই বিরাট হাঁ—ঐ যে পালঙ্কে শায়িতা এলোচুল, কপালে কালনাগিনীর চুম্বক, সারা দেহখানি আরতির ঘণ্টা বেজে ওঠার আগের ঝিলিমিলি মন্দির, ধূপধুনা-জ্বালানো, থমথমে প্রতীক্ষায়। শুধু মন্ত্র ধ্বনিত নয় যখনো ও পালানোর পথ বন্ধ, আমি স্থাণুবৎ, গলায় রুখে রেখেছি ফিনকে-ওঠা রক্ত, হাত দিয়ে ঠেকাচ্ছি উপড়ে-আসা চোখ, বোঁ করে ঘুরে আসা তখন—এই এখন—নিজেরি বৃত্তে বারবার, আওড়ানো গৌরচন্দ্রিকা-আরম্ভ-লামা-তিব্বতী থালা, কথাকে শুইয়ে দিয়ে তার উপর একই কথা এমন দুমদাম চাপানো যাতে অক্ষরগুলো লেপ্টে যায় একটা-আরেকটায়, চীনে-চ্যাপ্টায়, দাঁতের পাশে কাতরাতে-কাতরাতে এসে জায়গা নেয় লিঙ্গ, কানের পাশে গোড়ালি, অর্থাৎ মৃত্যু-মৃত্যু-মৃত্যু, অথবা ভাইবোন-পাড়াপড়শি-বন্ধুজন যারা ভিড় করেছিল জানালায় কোনো জোনাকি-জ্বলা রাত্রে কি কখনো করেনি কি আবার করতে আসবে একদিন, হে দয়া-আশীর্বাদ-দেবতারা-রাক্ষুসী-গ্রামের দুঃখ, এবং ঐ তুমি যোনির স্বেদসিক্ত হাঁ যার থেকে এখনো আমি জানি-না-ঠিক-কতখানি দূর, আপাতত এই নাও উপহার এক শবের, কবরের, যা আমারই।

অসম্ভবের রাজ্য

কথা যখন দুখান হল, রক্ত ছুটল ফিনকি দিয়ে, তার আগের অবস্থার বর্ণনায় ফেরা মানেই ঘরে ঢোকার প্রসঙ্গের উত্থাপন, অর্থাৎ যাত্রার প্রথম সেই পদক্ষেপ, যদিও যার ঐক্যের ইমারত এই নতুন অভিজ্ঞতায় এতক্ষণে ধূলিসাৎ, উড়ে যায় হু-হু হাওয়ায় যা এককালীন মিনারের চূড়াবিশেষ, এখন শুধুই ছিন্নবিচ্ছিন্ন ঠুনকো স্বর সেইসব যাদের চিনেছিলাম নিটোল ঋষভ বা কড়ি-মধ্যম হিসেবে সম্পূর্ণ এক কলির, তবু

দিনশেষের রণক্ষেত্রে লণ্ডভণ্ড মুণ্ডের মাঝে জোড়াতালির চেষ্টায় বিচিত্র দর্জিই যদি আমি, হাতে ছুঁচ-সুতো, তো সেটা রচনা করতে নিজেরি এক পরম্পরার ইতিহাস, এবং যাও ব্যর্থ হতে বাধ্য জেনেই,

কিম্বা সেই কারণেই, যাতে অগণ্য ব্যর্থতাগুলিকেও অন্তত

মেলানো যায় একটি মালায়, ঐ ছুঁচ-সুতোর কারসাজিতেই। অতএব

ফেরা যাক ঘরে, অর্থাৎ তারো আগে ঢোকার মুহূর্তে যখন সবেমাত্র চৌকাঠটি পেরিয়েছি, তখনো কোন্ দুঃখের গোধূলি-চেতনায় রঞ্জিত হৃদয়, পেরিয়েই অভ্যাসবশত প্রার্থনা করেছি এমন একটি দৃষ্টির যার বিশেষণ মানুষের অভিধানে আজো কোথাও নেই, পেয়েছিও দৃষ্টি, ও তাইতে তাকিয়েছি একে-একে পর্দার দিকে, মাটির

পাত্রে চশমার খোপে—একটা থেকে আরেকটায়

লাফিয়ে-চলা গঙ্গাফড়িঙ আর নই, কারণ সব তাড়ার ভাব ততক্ষণে ফেলে দিয়েছি জানালার বাইরে, দূর গম্বুজে মিলিয়ে যায় শেষ কিছু যে-রক্তিম আলো তাতেও দিশেহারা হচ্ছি না, বরং চোখ পড়েছে যদি একটিতে তো সে-চোখ রাখা ঐ একটিতেই, যদি পর্দা তো পর্দাই, অন্তত ততক্ষণ যতক্ষণ লাগে তার ভিতরে ঢুকে সব তন্নতন্ন দেখে নিতে, শুধু দৌড়বাজের মতো চৌহদ্দি পরিক্রমা নয়, তার যত গোপনতম বগল লিঙ্গ গুম্ফাও, হঠাৎ-ই সমুদ্র বা কোনো, যারও অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়ে ডুবুরী আমি খুঁজি ও খুঁজে পাই তলদেশে ছড়ানো-ছিটানো মণি-মাণিক্য মুক্তা শঙ্খের কণা, কোথাও জাহাজডুবির ধ্বংসাবশেষ, যদিও কিছু কুড়ানো নয়, ছুঁতে হাতটিও না বাড়ানো, শুধু দেখে যাওয়া, যেখানে যা-যা আছে যেমন তাকে তেমনি থাকতে দেওয়া, পরেই

বেরিয়ে এসে প্রবেশ ঘরের অন্য সামগ্রীতে, এই যেমন মাটির পাত্রে বা চশমার খোপে বা কুলুঙ্গির উপরে কৌটোয় এবং যেখানেও ফিরে-ফিরে একই প্রণালী পরিক্রমার ও ডুবুরীর ঝাঁপের। এখানেই

থামত যদি থামা এই বর্ণনা তো অনায়াসে টাঙানো চলত দেয়ালে-দেয়ালে কত-না চমৎকার ছবি আমার পরিক্রমার, সাঁতার কাটার, ঐক্যের সুরটিকে বইয়ে-সইয়ে বাজাতাম যখন-খুশি কলেরগানে —কিন্তু কী এমন ঘটে থাকতে পারে ইতিমধ্যে যাতে হঠাৎ ফাটল ধরেছে সর্বত্র, সুষুপ্তিতে আর্তনাদ, চারিদিকে রঙ মানে তাজা প্রাণেরই রক্ত, সহস্র দুঃখের-স্বপ্নের খুন? জানি

না। শুধু দেখছি কৌটো

কী করে হঠাৎ কৌটো নয়, জাহাজ জাহাজ নয়, এবং গণ্ডগোলটা নাম নিয়ে নয়, সত্তা নিয়েই, যেহেতু সকলেই যে-যার দেহ ও সম্ভাবনার সীমানা ছাড়িয়ে তড়াক-তড়াক লাফ মারে শূন্যে, নিজ-নিজ

হাহাকার ও অভীপ্সার একটি অন্ত্য অন্তরীক্ষে—অর্থাৎ কুলুঙ্গিতে থেকেও কৌটো কতটুকু কুলুঙ্গিতে? সোনার মুঠো-মুঠো বাষ্প হয়ে যে সে অনেকখানি কেবলই উড়ে যায়, ছিটকে-ছিটকে-পড়া তার নাসারন্ধ্রে-অস্ত্রে-যন্ত্রে, আকাশের চোখ বন্ধ করে ধ্বংসের ফুলঝুরি। আমার

জগৎটা হয়ে দাঁড়ালো তাই এই অসম্ভবের রাজ্যই, এই ঘরেও—দেয়ালের নাটমঞ্চে-মঞ্চে যার পরিচিত রাম-শ্যাম-যদু আর নেই, সজীব কোনো পুত্তলীর নাকের নোলকও নয়, কেবল

দাঁত-মুখ-খিঁচানো হাসিতে ফেটে-পড়া একের-পর-এক মুখোশ।

ছন্দ

আবদুল মান্নান সৈয়দ

আমি অনন্তের শাখা-প্রশাখায় আটকে-যাওয়া পৃথিবী-ঘুড়ির মতো
আমি রুমালে বরফ বেঁধে প্রবল হাতুড়ি-ঘায়ে চূর্ণ করেছি
আমি গোলাপ-বাগের সাত-তলা প্রাসাদের সিঁড়ি বেয়ে
 ধাপে-ধাপে উঠতে-উঠতে পড়েছি হঠাৎ
আমি সেই বৃষ্টিবিন্দু বহুদূর মেঘেলা আকাশ থেকে নেমে পড়ি
 রৌদ্র-পিচ্ছিল শহরের এক কবি-র সম্মুখে
সময়ের লতাপাশ ছিঁড়ে মাথায়-জড়ানো মুকুটের মতো প'রে
 বেরিয়ে যায় উন্মাতাল হরিণ আমার
অ্যান্টেনা পুঁতেছি আমি মাথার ভিতরে
স্পন্দিত রাখাল আমি একটুখানি মুঠো খুলে ছড়াই স্বপ্নের বীজ
আমাকে অগ্রাহ্য ক'রে আমারি উৎসাহী হাত
 নেমে যায় থল্‌বল্‌ বৃষ্টিজলে চাঞ্চল্যের মাছ ধরতে
দুরন্ত শিশুর মতো আমি শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিতের গালে চাঁটি মেরে
 ছিঁড়েছি ফর্ফর্ ক'রে ব্যাকরণ-বই
শিশুর হাতের পাপড়িরাশি নীল মেঝে ভ'রে ফ্যালে আকাশের
সেই আকাশ-আনন্দে আমি পৃথিবীর দুঃখ ভুলেছি
যাবার আগের দিন শম্পা বলেছে
 আমাকে তোমার বিশাল মুক্তির বাহুবন্ধনে বেঁধে রেখো

প্রতীক্ষার অর্ফিয়ুস

সিকদার আমিনুল হক

আরোগ্যের জন্যে আমি আসিনি। যেখানে বিষণ্ন শুশ্রূষার হাত, সেখানে একটি অঙ্কুরের জন্ম হবে, এই আশ্বাস আমাকে আচ্ছন্ন করেছিল। নারীর রেশমে যে উষ্ণতার, উৎসবের প্রবাহ, সেই স্নিগ্ধ আয়োজন ছিন্ন করার কল্পনার মধ্যে কত উদ্দীপনা ও আকাঙ্ক্ষার চিহ্ন ছিল একদিন।

সাবানে হাত ধুয়ে প্রাঙ্গণে দাঁড়াতে পারতুম। পবিত্রতার দিন আকাশের নীচে যেমন মানুষেরা থাকে। কিন্তু লালসার হাহাকার আছে; আমাকে ধিক্কার জানাতে আসবে ঝড়ো হাওয়ার মতো নারীরা। যেন বন্য জন্তুর পায়ে-পায়ে দলিত হবে প্রস্রবণের কোমলতা।

হে নারী, ভালবাসা ও শুভেচ্ছার মধ্যে কোন নগ্ন কলঙ্কের চিহ্ন ছিল না। কিন্তু যখন তাঁবুর বাইরে এসেছি, ঊষর মাটির সামনে আমাদের স্মৃতির কোন চিহ্ন নেই। উত্তরাধিকার রেখে যাবো যে দ্বীপের মধ্যে, সেখানে নির্দিষ্ট কোন নক্ষত্র নেই। উচ্চাকাঙ্ক্ষার অশুচি আবরণের মধ্যে শুধু বিলাপ ও উদ্ভিদের হতাশা।

প্রপাত যে প্রত্যাশা জাগাবে, সেখানে আমি তোমার মুখ অঙ্কিত করলুম। যে অপেক্ষার মাটিতে ফলের জন্ম হবে, সেখানে আমি নামাতে পারবো বাতাসের গুচ্ছগুচ্ছ উপহার। অভিভূত সন্তানদের সামনে; হে নারী, বিশুদ্ধ হোক এই নিস্তব্ধতা। মানুষের জন্ম হোক।

শালদা নদী

বেলাল চৌধুরী

গভীর রাতের ঘুম চিরে কালো কড়কড় শব্দে
নেচে ওঠে অর্ধস্ফুট চৈতন্যের প্রচ্ছন্ন অতলে
মেঘের থির বিজুরি—
সুমুখে দেখি খুলে যায় সটান
আঁকাবাঁকা স্মৃতিঘেরা অচেনা স্বর্গসোপান
অলীক শালদা নদী, ঘুঙুর পায়ে নীল ময়ূরী
না কি পাথুরে বালির দেশে অতর্কিত
ফণীমনসার ফুল ?
বাঁকাচোরা খরস্রোতা হাওয়ার ঘূর্ণী সঞ্চারে তীব্র নিখাদ,
থেকে থেকে বহে দমকা ঝড়ের প্রবল জোয়ার,
চন্দ্রাতুর শালদা নদী তখন কী গভীর, কী বিপুল
সাধে মরমিয়া গান মর্মের অধিক ব্যাপ্তি তার—
কাঁথালে জড়ানো পাছাপেড়ে রণরঙ্গিণী
বর্ণিকাভঙ্গে
মৎস্যগন্ধা অভিসারে যেন অনন্ত বাসুকী ;
ধীরে বহে খলখল বালুময় রজত তরঙ্গরাশি ।

পেরিয়ে মধ্যরাত দূরগামী স্বপ্নের ভৈরবনিনাদ
উঁকিঝুঁকিমারা ভরা চৈত্রের টালমাটাল শিমূল
বহে যায় ঝুপঝুপ পাড়ভাঙা দুরন্ত হিল্লোলে
সরব-গতির স্পন্দন আলোড়িত সুদূর শালদা নদীর গান ।

ফল্‌স্‌টাফ

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

কেন যে এমন ভুল ! তোমার আপন রাজ্যপাট
ছেড়েছুড়ে ছুটলে তুমি অকালকুষ্মাণ্ড যুবকের
সংকীর্ণ সভায়, ধর্মপরায়ণ বিশুদ্ধ বকের
সফেদ আশ্রমে— সদিচ্ছার সদাচারে জমজমাট ।
ভালো কি লাগত ওই পুরুতের ধর্মগ্রন্থপাঠ,
আসত মাথায় ঢালা জর্দানের জল, যাজকের
কম্প্রকণ্ঠঅভিষিক্ত বিবাহিত প্রেম, ঘাতকের
নিপুণ সংহার, দেশ, দেশাচার, কৌটিল্যের হাট ?

চলো ফিরে চলো সেই শাশ্বত ভুবন, হে ভুলের
অধীশ্বর, স্ফীতোদর, যৌবনের অজেয় পূজারী—
অনর্গল মিথ্যা দিয়ে গড়ো তুমি সত্যের বাগান ।
খ্যাতি নয়, কীর্তি নয়, বিত্ত নয়— অনিরুদ্ধ প্রাণ,
অসতর্ক ভালোবাসা, ভবিতব্যহীন, স্বেচ্ছাচারী,
কড়া মদ, গাঢ়-ঘুম, কুরুক্ষেত্রে গান বুলবুলির ।

তার আছে

আসাদ চৌধুরী

তার আছে নিজস্ব যৌবন ; শৈশব কৈশোর নেই
ছিল না কখনো। আমরণ দারুণ যৌবন তাকে
জড়িয়ে রেখেছে, তাই যারা শিশু তারা তাকে দেখে
উঁচু-গ্রীবা, যেন এক সম্মানিত প্রধান পুরুষ।
সমানবয়সী যারা পায় তারা মোহন আশ্বাস
নিঃশ্বাসের বিশ্বাসের নিরাপদ নিবিড় বিশ্রাম।
নিজস্ব যৌবন নিয়ে তার না-না ঝকি ও ঝামেলা
বিধান, শৃঙ্খলা, রীতি ফুল তোলে তাহার রুমালে
কখনো বা জুতার কাঁটার মত গোপনে খোঁচায়
তবুও দাম্ভিক যুবা হাসিমুখে কবিতা শোনায়।

বৃদ্ধ লোক দেখে তাকে আপনার নিজস্ব অ্যালবামে।
দর্পিত যুবক তাই মুখ তার দর্পণে দেখে না।
মাঝে মাঝে ঝড় এসে তার চুল ঠিক ক'রে দেয়,
পাহাড়ের ঢেউগুলো যেন তার নরম বালিশ॥

অন্তর্ঘাতক

মুহম্মদ নূরুল হুদা

প্রত্যাখ্যাত
তোমার দুয়ার থেকে ফিরে আসি, বন্ধ করি
নিজের দুয়ার ;
আমারো বাড়ির পাশে নদী আছে, হাওয়া দেয়
সকাল-বিকাল, ডেকে বলি : এ বেলা
থামাও খেলা, অন্য-চিন্তা আছে ;
শব্দময়ী, তা-হলে বিদায় !

আমার আরেক বন্ধু পদার্থবিজ্ঞানী,
তাকে বলি : বিভাজন করে দেখো
আমার শরীর ; আছে,
বেশুমার অণু আছে শরীরে আমার ;
দাও, গড়ে দাও
আমার শরীর থেকে একেকটি অণু তুলে নিয়ে
একেকটি তেজস্ক্রিয় বিস্ফোরকে
আমাকে সাজাও।
দেবো,
আমার শরীর-শুদ্ধ ছুঁড়ে দেবো দুয়ারে তোমার।

তোমার বিরুদ্ধে নই, না, আমি বিরোধ বুঝি না
'সর্বাংশে মানুষ'— শুধু এই ত্রুটি সারাতে পারি না॥

ফুলের মতো ভঙ্গুরতা ফুটে আছে

শিহাব সরকার

নারীকে যতবার চিত্রধর্মী করে বানাতে চাই
থাকে না, শতখণ্ডে ভেঙে যায়
যেন ওর স্বভাবের চার দেয়ালে
ফুলের মতো ভঙ্গুরতা ফুটে আছে

কখনো শীতল আশ্রয়ের লোভে ছুটে যাই
নারী গম্ভীর পদ্মের ভেতর থেকে হাসে
কখনো শীর্ণকায়া ভিক্ষুণীর প্রায় দেখে ভাবি
এই তো আমার অসহ্য সুন্দর প্রতিমা!
থাকে না, হীরকচূর্ণের মতো ভেঙে যায়
যেন ওর স্বভাবের চার দেয়ালে
ফুলের মতো ভঙ্গুরতা ফুটে আছে

নারীও শিল্পের কথা বলে
একেক সন্ধ্যায় ওকে বড়ো মধুর বিষণ্ন দেখি
আমি যখন শৃঙ্গারে উদ্যত হই
ও স্বেচ্ছায় নগ্ন ঈশ্বরী হয়ে কাঁপে
তীব্র কবিতার মদে নিজেকে বিস্ময় ভেবে বলি
নারী, তুমি আরেকটু জ্যোৎস্নায় প্লাবিত হও
ঈষৎ দুঃখিত হও

থাকে না, রঙিন কাঁচের মতো ভেঙে যায়
যেন ওর স্বভাবের চার দেয়ালে
ফুলের মতো ভঙ্গুরতা ফুটে আছে
কেবল দুশ্চরিত্র অপবাদ নিয়ে
খণ্ডকবিতার পাশে পড়ে থাকি আমি

উৎসবপ্রাঙ্গণে প্রার্থনা

জাহিদুল হক

তুমি যেই হও তুমি কারো প্রিয় কিনা উৎসবপ্রাঙ্গণ জুড়ে তুমি কারো
আনন্দের উৎস কিনা, আজ শুধু ক্ষমা করে দাও। ওখানে অনেক দাহ—
ওরা শুধু ভুল করে সাজিয়েছে সমস্ত আঙিনা, বেঁধেছে ধানের গোলা
ঘরে-ঘরে, শস্যের প্রশস্ত ক্ষেত বহুদূরে ফেলে রেখে এসেছে এখানে—
ওরা শুধু জন্মের প্রকৃত কান্না কিন্নর সঙ্গীতগুলো আজ ভুলে গেছে।
ওখানে অনেক ভুল জড়ো হয়ে আছে ওখানে অনেক ব্যথা বিষকাঁটা
ঘৃণা ক্লেদ আর আমি : আমি মানে এ-উৎসবে প্রার্থনার উচ্চারণকারী,
এ-উৎসবে আনন্দের অংশীদার, দীর্ঘ স্থির গাঢ় এক হিম অন্ধকার—

হাত রাখো অপচয়ে আজ এই দুঃখে হাত রাখো, যেই হও তুমি কারো
এ আগুনে জল ঢালো, জল ঢেলে দাও। পুণ্যবান হাত দিয়ে স্পর্শ করো
এই পাপে, যে আমাকে মিথ্যে এক বোধিদ্রুম দেখিয়েছে জন্মের সকালে,
যে আমাকে ভুলিয়েছে বলে অভিমান ভুলে গেছি আমি মৃত্তিকার কাছে :
যেখানে শিশিরে ঘাসে মাখামাখি যেখানে বৃক্ষের মতো বেড়ে ওঠে শুধু
প্রেম, একজন অভিমানী কালো পুরোহিত। তুমি ওকে ডাকো এইখানে-
তুমি যেই হও তুমি কারো প্রিয় কিনা উৎসবপ্রাঙ্গণ জুড়ে তুমি কারো
দুঃখ অভিমান কিনা, আজ শুধু ক্ষমা চাই আজ শুধু ক্ষমা করে দাও।

স্বাভাবিক

মহম্মদ রফিক

আমরা প্রত্যেকে দেখো কেমন সময়ে অযাচিত
কাছাকাছি চলে আসি, প্রজাপতি এই ডাল থেকে
অন্য ডালে উড়ে যেতে পথিমধ্যে ক্রুর মানুষের
গুপ্ত হাতে ধরা পড়ে, অন্য কারো সমৃদ্ধ খাঁচায়
বন্দী পাখি ক্ষীণ স্বরে গান গায় পুচ্ছও নাচায়,
কে কাকে দুষবে বলো, এ-ই ঘটে, এ-ই স্বাভাবিক ;

সবকিছু গুছিয়ে ফেলতে হয়,— যে জাল মাছের খোঁজে খোঁজে
ব্যবহৃত সারাদিন রোদ্দুরে শুকোতে হয় তাকে,
বঁড়শি গুটিয়ে নিয়ে কৃতকার্য হও কি না হও
সন্ধ্যায় পুকুর ছেড়ে ফিরে যেতে হয় ভাঙা-মন
ব্যর্থতায় অন্ধকার এবড়ো-খেবড়ো গেঁয়োপথ,
হতোদ্যম নুয়ে-পড়া পুরনো বাঁশের জীর্ণ-সাঁকো ;

অলৌকিক বলের পিছনে ক্লান্ত ধাবমান চির-শিশু-দল
বয়স বাড়ে না কারো, তবু চলে দুপুর গড়িয়ে
কখন বিকেল হবে, কতোক্ষণ আর ছোটাছুটি,
হঠাৎ ঝড়ের মেঘ ঈশানে নৈঋর্তে রুদ্ধশ্বাস ;
আমরা প্রত্যেকে দেখো, কাছাকাছি কেমন সময়ে,
এই ঘটে, ঘ'টে থাকে, সব-কিছু এ তো স্বাভাবিক ॥

মৃত্যু এক পুষ্পিত পথিক

মহাদেব সাহা

কোনো কোনো মুহূর্তে এই মৃত্যুও হয়ে ওঠে জীবনের গূঢ় অভিষেক
আরো গভীর বাঙ্ময়। সে মৃত্যু প্রার্থনা করি, সে মৃত্যু প্রণাম করে যাই
একদিকে তুমি, একদিকে মৃত্যুর মৌনতা যেন বৃক্ষের ছায়ায় আরো শুদ্ধ পুণ্যশীল
আলোর উপরে আরো কোনো অপার্থিব রোদ এসে
করে যায় সবুজ মার্জনা ;
দুধারে পথের পাশে নাম লিখে যাওয়া তো মূর্খতা
মানুষে পথিকে তবু জেনেশুনে রেখে যায় নিজস্ব নিশানা। তারা নিলামে ওঠেনি!
মৃত্যুর পরেও যাহা সুখ যাহা প্রাপ্য যাহা নিশ্চিত ভোগের
আমি হাসিমুখে রেখে যেতে পারি
তাহলে কি নিয়ে যাবো মৃত্যুই মৃত্যুতে ? আমি মূর্খ দৃঢ় শারীরিক
যদি মরি পৃথিবীরই সুখে মরে যাবো।

একদল কেশরফোলানো সিংহ, মহিষের ক্রুর কালো ঝাঁক
কিংবা কোনো তারও চেয়ে অজ্ঞাত অনাম্নী অতিশয়
সূর্যের ভিতরে আরো এক লক্ষ বাদামী অশ্বের ছুটোছুটি, ধুলো অন্ধকার
এভাবে মৃত্যু কি আসে রোগে কি অসুখে
কিংবা মরমী শয্যায়।
এর মধ্যে যেতে হবে কতোদূরে কতো কাছে কতোটা সংজ্ঞায়
আমি জানি সে দূরত্ব শুধু এই স্মৃতির অতীত আরো অশেষ অগাধ,
কখনো কখনো তাই বাস্তবিক ভয় পাই ঘর ছেড়ে তাঁবুতে লুকাই
বলি মৃত্যুতে যাবো না তার চেয়ে এসো খেলা করি
এসো মধ্যরাতে অজ্ঞাত রাস্তায়
নেমে কোলাকুলি করি, সে সময় মাথার উপরে আরো বৃষ্টি হবে
গাঢ় মমতায়
এইভাবে স্নান করে এইভাবে ঋণী হয়ে জন্মের দূরত্বে চলে যাবো।

এইখানে ধুলোস্পর্শী পৃথিবীর মায়া এসে পড়ে
অনন্ত সূর্যাস্ত দেখি কী প্রাচীন কী গভীর কমলালেবুর
মতো মধুর মায়াবী

এভাবে মৃত্যুকে দেখি তার সঙ্গে এভাবেই চেনা এভাবেই মৃত্যুও আত্মীয়
আমাদের জানালার ধারে এসে কথা বলে যায়,
করে পরম আদর, অন্য কেউ যাকে ভাবে নিতান্ত অস্পৃশ্য
তাকে মৃত্যু শিশুর মতোই গালে মুখে চুমু খায়, ডাকে।
এমনও মুহূর্ত আসে এমনও তন্ময়
মধ্যরাতে ফুটপাতের অজ্ঞাত কংক্রিট তার চোখে ঝরে জল
ধীরে ধীরে কাছে আসে মৃত্যু এক পুষ্পিত পথিক।

দ্বি-মুখী চিতল ছায়া

হাবীবুল্লাহ সিরাজী

কে তার আপন হয়, নিদ্রাকালে পাশাপাশি রাত ?
কে তার আপন বলো, হরিদ্রাভ মেঘচূড় নারী ?
কে তার আপন থাকে, জ্যোৎস্নায় বেজে ওঠা বাঁশি ?
না, কেউ যেন কারো নয়,
রাত নয়
নারী নয়
বাঁশিও তো নয়—
মুগ্ধ এক স্মৃতিভূমি
আমাদের মগ্নলোকে
প্রবেশের পথ খুঁজে ভ্যায়—
আর এই বুঝি রাত-নারী-বাঁশি মিলে
জীবনের চরম বিস্ময় !

কী এমন সুখ-পাখি, যার পাখা জানে না উড়াল !
কী এমন স্বপ্ন-ছায়া, যার মাপে নগরীর ছাদ !
কী এমন শব্দ-স্রোত, যার ফেনা রাখে শুদ্ধ-কাল !
না, কেউ কিছু নয়,
পাখি নয়
ছায়া নয়
স্রোত নয়—
মৌন নীল এক জলাশয়
খণ্ড খণ্ড ক'রে ফ্যালে জীবের হৃদয় ।

চন্দ্রের গ্রহণ থেকে যেই ছায়া আজো
উলোট-পালোট হয়ে জন ও জনকে
বর্ষণের শান্তিমত নামে পৃথিবীতে—
তার কিছু রশ্মি নয়,
নয় স্নিগ্ধ ঋষি-ঋদ্ধ সূর্যের সম্পাত ;
এক মুখে অন্য মুখ— জলে কাঁচ, কাঁচে কাঁচে জল
এপিঠ ঘুরিয়ে দিলে যেই আলো, ছায়া তার প্রগাঢ় চিতল ॥

ফিরে আসে যত্নে, অধঃপতনে, মৃত্যুতে আর মহিমায়

সানাউল হক খান

একজনের গড়পড়তা আয়ু তো ছাড়িয়ে এলাম।
পেছনপানে
তবু কেন ফেলে-আসা অধঃপতনের
আধ-ক্রোশ মাটিতে
এরকম অর্থহীন চেয়ে থাকা ?
যেটুকু মাড়ানো ভুমি জুড়ে জন্মেনি তৃণের মুখ,
ঠিক সেইখানে, মাটির অতল থেকে
অমরত্বের শিকড় ছোঁয়ার কেন অত সাধ ?
একজনের গড়পড়তা আয়ু তো ছাড়িয়েই এলাম !

এক-একবার মানুষের কাছে খুব, মৃন্ময়, গিয়েছি পশু হয়ে
এক-একবার পশুর কাছে কোনো ধোয়া-মোছা পবিত্র মানুষ—
তবু কারো বরণভঙ্গি আমাকে দেয়নি তো কোনোদিন
মন-পোষা আনন্দের চেয়ে এতটুকু অধিক রহস্যময়তা :
যোজন যোজন চোখের ছায়া থেকে পেলাম না তো
নিজের জন্যে আলাদা রাখা সেই আদরের জলমণি—
যে আমাকে কাঁদাবে খুব শীতল মুখের যত্নে ! . . .

বহু দিবাভাগ কেটে গেছে আমার শুভরাশির দর্পে
বহুবার রাত্রিতে ফের, নিদ্রার ভেতর, লক্ষ মিথুনের নরম মমত্ববোধ,
অথচ শরীরের ভেতর আজো এক অমর শিহরণ
যৌবনের শ্রেষ্ঠ জাগরণ খোঁজে !

বহুদিন স্বেচ্ছায় কোনো কিছু না-পাওয়ার দীনতা নিয়েছি বুকে
বহুদিন স্বেচ্ছায় ছিলো অধিক প্রাপ্তির আকণ্ঠ আনন্দ
অথচ বয়স—কতোটুকু ইস্পাতের অহঙ্কার পেলো,
কে জানে প্রাণে তার কতটুকু প্রসন্নতা ?
অনেক বাস্তবতার সারকারামার মধ্যে
নিজেকে লেগেছে কোনো রশ্মিময় পতঙ্গের শোভা

আবার অনেক অবাস্তব নাটকের মানুষ আমাকে বলেছে
— চলো না বরং তার চে' কজন মিলে
কুরু-পাণ্ডবের পাশা খেলি আরেকবার . . .
তবুও জীবনের কোনো পরম ভগ্নাংশ
আমার তাড়িত ক্ষয়ক্ষতির ভেতর দেয়নি তো অমর সৃজন
কেবলই চরিত্রের ভেতর কোনো বিশাল সিদ্ধ পুরুষ
বারবার ফিরে আসে যত্নে, অধঃপতনে, মৃত্যুতে আর মহিমায় . . .

পাবো তাকে

আবুল হাসান

চারা রুইয়ে দাও উজ্জ্বল শ্যামল চারা
হলুদ কপির শিশু, শীতকালে কোল দাও
ঘন কুয়াশার ভোর, চারা তোর বাড়ুক শোভায়।

জল বইয়ে দাও, ছায়া বর্ণময় ঘন জল
খরার কবলে হও সুশীতল মাটি মৌন মুরতি মঞ্জুষা
বীজ বাঁধো, মৃত্তিকায় সুন্দরের অতল যাত্রায়!

খনি খুলে যদি পাও গুচ্ছের গভীর সোনা, সূর্যের প্রসূন
তবে কেন খুলবে না খরা, জল, পাথুরে সম্বল?

যাও রুইয়ে দাও চারা, শিশুঘাস, বোধি, বুনো ফল
আমি প্রার্থী বসে আছি, পাই যদি শুভার্থী সফল!

যাবেন নাকি

আবু কায়সার

উপশহরের আড়ালে-আবডালেও ছিলো ফানুস
বানাতে জানা কারিগরের বাড়ি, খেলার বাগান
জাদুকরের তীক্ষ্ণ তাঁবু, কিউরিও শপ, এন্টিলোপের মাথা
মহিলা মর্দানার জন্যে ভিন্ন গোসলখানা—
সত্যি বলবো সুঠাম শয্যা, ছাপোষা ছারপোকা
আরশোলা ঝুলকালির চিহ্ন ছিলো না আশপাশে।

সে ছিলো এক নির্মীয়মান খেলামেলার শহর
ভাঁজখোলা মানচিত্র যেমন কাঠের খণ্ডে বাঁধা—
দুর্দশা শুওরের খোঁয়াড় দেখতে দেখতে পচা
চোখের জন্যে খুব জরুরি—এ্যাসিড ও চন্দনে
অমন সমন্বয় দেখিনি বানিয়ে বলবো না।
মারণউচাটনের শিল্প? মরা ঘোড়ার নিলাম?
সত্যি বলবো নেই সেখানে, প্রাতর্ভোজনকালীন
দেখিনি দুর্ভিক্ষে-পোড়া উদলা ও চোখবোজা
জেনানাদের
খবরকাগজজোড়া ছবি :—লক্ষীমন্ত শহর।

উপশহরের ভিতরে থাকে ছোটমাপের মানুষ
ঘুড়ি ও লাটাইয়ের ব্যবসা ঝুটঝামেলা নাই
সেখানে আমি বেড়াতে গেলেই ইকেবানার কুশলী কন্যারা
হাসতে হাসতে শিকলবাঁধা কুকুরসহ গতর ঘেঁষে দাঁড়ায়।

উপশহরে যাবেন নাকি অপশহরের মানুষ!

আবহমানকাল

অসীম রায়

এক দীর্ঘস্থায়ী ঘুম বা এক দীর্ঘস্থায়ী স্বপ্নের মধ্য দিয়ে অনিন্দ্য হেঁটে চলেছে। মাঝে মাঝে এই স্বপ্নের অবাস্তবতায় অস্থিরতা বোধ করেনি এমন নয়। কিন্তু জাগ্রত জগতে প্রবেশ করবে কিভাবে? মেদিনীপুরের এ. ডি. এম হয়ে অথবা তার ছোড়দার মতো খবরের কাগজের চালিয়াৎ চন্দর হয়ে ডানা মেলবে? তাছাড়া জীবনবোধ আর জীবিকাবোধ—এ দুটো কথা হরদম মন্ত্রের মতো এমনভাবে সে আওড়াতে শুনেছে চারপাশে গত দু-তিন বছর যে বিপ্লবীর একটা নির্দিষ্ট জীবনের ছক তার চোখের সামনে সবসময় ভাসছে। সে ছকের বাইরে যাওয়া মানে শুধু বিপ্লব থেকে সরে যাওয়া নয়, তার মানে আত্মিক মৃত্যু। সে ছকের বাইরে যে জীবন সে সম্পর্কে টুটুলের কোন উৎসাহ নেই।

এমতাবস্থায় টুটুলকে যেতে হল কালনায় সারা পশ্চিমবাংলায় ছাত্র-শিক্ষক ধর্মঘট সংগঠনের অন্যতম নেতারূপে। স্টেশন থেকেই টিকটিকি পেছন নিল। একে টুটুলের পথঘাট অচেনা, তারপর নীল বুশশার্ট আর সানগ্লাস-পরা ঢেঙা টিকটিকিটার নজর এড়াতে গিয়ে একেবারে পথ হারিয়ে ফেলে। একটা মিষ্টির দোকানের সামনে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে খেয়াল হয় খিদে পেয়েছে। কোন চিন্তা না করে ঢুকে পড়ে। ঢুকতেই দেখলে তাদের কনট্যাক্টম্যান মদনবাবু সিঙাড়া খাচ্ছেন।

—আসুন আসুন, সারা সকাল বসে আছি।

বছর পঞ্চাশেক বয়স লোকটার, আগেও দু-একবার দেখেছে কলকাতায়। আশ্চর্য সজীব কিন্তু পিচুটিপড়া একজোড়া চোখে অনিন্দ্যর আপাদমস্তক পরীক্ষা করে লোকটা বললে,—স্ট্রাইক হচ্ছে?

—নিশ্চয়।

—এখানে অবস্থা ভাল নয়। একেবারে টেম্পো নেই।

—টেম্পো তুলতে হবে। নেই বলে থামলে চলে? টুটুল তার নতুন দায়িত্বে গম্‌গম্‌ করে।

বিকেলে স্কুল শেষ হওয়ার পর স্কুলেই টুটুল বক্তৃতা দেয়। একেবারে ঝড়ের মতো বলে। শুনতে বেশ লাগে। তার কচি দাড়ি, ঝাঁকড়া চুল, বড় বড় চোখ, হাত নাচানো—সমস্ত কিছু এক নির্দিষ্ট লক্ষ্যে শ্রোতাদের ঠেলে দেয়। মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ কটাক্ষ, ব্যঙ্গ, শাণিত ফলার মতো ঝকমক করে। আর বাংলার ওপর চমৎকার দখল থাকায় টুটুল যেন কথার হাওয়ায় উড়তে থাকে।

এ সাফল্য খুব হালের। সাত-আট মাস আগেও সে বক্তৃতায় ছিল একেবারে আনাড়ি। বক্তৃতা দেওয়া ছিল তার কাছে কবিতা লেখার মতো, বেশ ভাবনা-চিন্তার ব্যাপার। তাতে তার জিভ জড়িয়ে যেত। তোতলামি বাড়তো, এমনকি বাক্যগুলো কোথায় শেষ হবে কি হবে না ভেবে বক্তৃতার মাঝখানে তার আতঙ্ক উপস্থিত হত।

—তুই একেবারে টিপিক্যাল! তার রাজনৈতিক সহকর্মী ও এককালীন ছাত্রনেতা তপন প্রায়ই বলত তার বক্তৃতা শুনে।

—টিপিকাল মানে?

—টিপিকাল মানে টিপিকাল। মানে তুই একটা হোপলেস।

তপন ব্যাখ্যা করেনি কিন্তু টুটুলের বুঝে নিতে বেগ পেতে হয়নি। ঠেকে সে শিখেছে যে আত্মসচেতনতা নামক বস্তুটি একেবারে বিসর্জন দিতে না পারলে ভালো বক্তৃতা দেওয়া যায় না। বক্তৃতার মূল লক্ষ্য ভাবের আদানপ্রদান নয়; সেরকম আদানপ্রদান হতে পারে আলোচনায়, যদিও সেখানে পরস্পরের মধ্যে সেতুবন্ধন অনেক সময় ঘটে না। আসল বক্তৃতা মানে সম্মোহন সৃষ্টি, আত্মসচেতন হলে তা কখনও করা যায় না। তার নিজের সাম্প্রতিক বক্তৃতা, যা প্রচণ্ড তারিফ পেয়েছে, তা লোকপ্রমুখাৎ আক্ষরিক ভাবে তার কাছে হাজির হওয়ায় সে অবাক হয়েছিল। তাতে ভাবাভাবের যে ছিরিভিরি নেই এমন নয়, কিন্তু যে সমস্ত অসুবিধে সামনে আছে, যেগুলো না মিটলে একেবারেই এগোনো যাবে না, তার কোন নামগন্ধ নেই।

সন্ধেবেলা যে দোতলা বাড়ির পশ্চিমদিকের ঘরখানায় তার আস্তানা হয়েছিল সেখানে ছাত্রেরা এল দেখা করতে। ছ-সাতটি স্কুলের ছাত্র। সারা প্রদেশব্যাপী আসন্ন ধর্মঘট কিভাবে সফল করতে হবে, কিরকমভাবে গ্রুপ মিটিং-এর মাধ্যমে ধাপে ধাপে টেম্পো তুলতে হবে, তার প্রায় তারিখব্যাপী গ্রাফ তুলে ধরে ছাত্রদের চোখের সামনে।

—মিন্‌মিন্ করে বললে চলবে না। যা বলবে জোর দিয়ে বলবে। সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংসের মুখে। তার বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন। সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত জোট বেঁধেছে কলে-কারখানায়, ক্ষেতেখামারে, কলেজ-স্কুল কমিটিতে। এরা আমাদের কী শেখাবে? কী পড়াবে? এদের কোনো আইডিয়াই নেই লেখাপড়া কাকে বলে।

ছেলেগুলি মন্ত্রমুগ্ধের মতো কথাগুলো শোনে। কারুর কারুর চোখ উৎসাহে জ্বলজ্বল করে। রুহু বলে ক্লাস টেনের ছেলেটি দলের নেতা। সে এতক্ষণ উসখুস করছিল কথা বলার জন্যে। টুটুলের শেষ কথায় সে লাফিয়ে উঠল।

—ঠিক বলেছেন কমরেড। আমিও তো ঐ কথাই বলছি অঞ্জনকে। ও বুঝছে না।

নেড়ামাথা রোগা ছেলেটা বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে ছিল। তাকে দেখিয়ে রুহু বলে,—আমি অঞ্জনকে বলছি এ সমস্ত লেখাপড়ার কোন মানে নেই। কিন্তু ও বুঝবে না। ওর বাবা মারা গেছে কিনা। ও বলছে যে কষ্টেই হোক স্কুলের শেষ পরীক্ষাটা ওকে পাশ করতেই হবে, নইলে ওর ভাইবোনগুলো নাকি ভেসে যাবে। দেখুন দেখি!

রাগতভাবে তাকালে টুটুল ছেলেটির দিকে। ছেলেটি কুঁচকে যায়। সদ্য শোকের ছাপ মুখ থেকে এখনও মেলায় নি। টুটুলের দিকে চেয়ে তার চোখ ছলছল করে।

—ও কেমন ছেলে?

টুটুলের প্রশ্নে রুহু এক মুহূর্ত থমকায়। বলে,— ও ক্লাসে ফার্স্ট বয়। কিন্তু কমরেড, আমাদের তো বেশী ক্যাডার নেই। ফার্স্ট বয় বলেই তো ওকে আমাদের আরও দরকার। এই শিক্ষা-ব্যবস্থার ভাঁওতামিটা আরও তুলে ধরবার পক্ষে…

হঠাৎ টুটুলের স্থিরদৃষ্টির দিকে চোখ পড়তেই চোখ নামিয়ে নেয় রুহু। বলে,—আপনি ওকে একটু বুঝিয়ে বলুন।

—এ আর বুঝিয়ে বলবার কী আছে? যখন পার্টির ডাক আসে তখন ফাস্ট বয় লাস্ট বয় বলে কিছু থাকে না, সব একাকার হয়ে যায়। তুমি তোমার মন শক্ত করো।

—আমাকে শুধু পরীক্ষাটা দিতে দিন, কাতর ভাবে ছেলেটি বললে।

আর তার গলার আওয়াজে টুটুলের হঠাৎ মনে হল তার স্বপ্ন কিংবা ঘুমের জগৎ থেকে সে বেরিয়ে আসছে। অথবা তার জগৎটা নড়েচড়ে উঠল। তার সেই দীর্ঘস্থায়ী বিপ্লবী ঘুমের দেয়ালে একটা বোমা ছুঁড়ে মারলে ছেলেটি।

—না না, পরীক্ষা দেবে না কেন? পরীক্ষা দেবে, কিন্তু তার মানে তো এ নয় যে পার্টি ছাড়তে হবে। পার্টিও করবে, পরীক্ষাও দেবে।

—হাতে সময় বড্ড কম।

—কার হাতে সময় বেশী? এরই মধ্যে সময় করে নিতে হবে।

— আপনি ওকে বলে দিন স্ট্রাইক পর্যন্ত পড়াশোনায় না ঢুকতে। রুনু যেন অঞ্জনের জবানবন্দী টুটুলের সামনেই মোসাবিদা করে ফেলতে চায়।

—সে তো নিশ্চয়! আগে স্ট্রাইক, তারপর পরীক্ষা।

সে রাত্তিরে অনেকক্ষণ টুটুলের ঘুম আসে না। এই ঘুমের আগের সময়টা তার নিজস্ব। তখন সে নিজের সাথে সঙ্গে কথা বলতে ভালবাসে, ঠিক প্ল্যান করে কথা বলতে কিংবা ভাবতে চায় না। চোঙার সেই চালিয়াৎ মন্তব্যটা—জিভে কোন হাড় নেই—মাথার মধ্যে নড়েচড়ে ওঠে। কিন্তু নিজের কেরিয়ারের জন্যে সুবিধেমতো মনোরঞ্জনের চেষ্টা আর এই সারাদেশের জীবনমরণের সমস্যায় কিছু ধরতাই বুলির আশ্রয় গ্রহণ কি এক? দুটো আলাদা নিশ্চয়, কিন্তু একেবারে অমিল? কোথাও ভুল হচ্ছে তার নিজের জীবনে সেটা সে আঁচ করতে পারে কিন্তু ঘটনার প্রচণ্ড স্রোতে টুটুল ভেসে চলে। মাঝে মাঝে সে নিজেকে প্রশ্ন করে, চোঙার চাকরির মতো তার কাজও কি এক বিপ্লবের চাকরি যার কতগুলো ধারা আছে, পরিণতি আছে। দু বছর আগে একথা মনে হয় নি যখন জেলের তালা তারা ভাঙতে গিয়েছিল। এমন এক পবিত্র শিখার মতো বিপ্লব জ্বলজ্বল করে জ্বলে উঠেছিল যার জন্যে সব কিছু করা যায়। সমস্ত স্বার্থ বিসর্জন দেওয়া চলে। কারণ দূর থেকে শোনা যাচ্ছিল অন্ধকারে কুয়াশায় চাকার ধ্বনি; লাল নীল বাবে মোড়া বিপ্লবের ট্রাম এখনই এসে যাবে, তার শিস কানে আসছে। সেজন্যে তার মতো আরও কিছু তরুণ তরুণী প্রতীক্ষা করছে ট্রামস্টপে। কিন্তু এখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ধরে গেছে, ঘাড় উঁচু করে চেয়ে থাকতে থাকতে ঘাড় টাটাচ্ছে। পরদিন সকালে আর-এক গ্রামে মিটিং করে মাঠ ভেঙে টুটুল দৌড়াচ্ছিল দূর স্টেশনে ট্রেন ধরবার জন্যে। সঙ্গে মদনবাবু তাঁর পিচুটিপড়া বড় বড় চোখ মেলে বলেন,—অতো ছুটবেন না, অতো ছুটবেন না। ঠিক পৌঁছে যাব।

কথাটা অদ্ভুতভাবে বাজতে থাকে টুটুলের কানে। সকালে শিশিরেভেজা আলুর ক্ষেতের ধার দিয়ে যখন সে ছুটছিল তখন চারপাশে মন্থর অথচ গতিময় জীবনযাত্রার সঙ্গে তার নিজের জীবনযাত্রার তুলনা করে তার জীবন একটু আজগুবি ঠেকে বৈ কি। মদনবাবু পেছন থেকে আবার চেঁচান,—অতো তাড়া কি কম্‌রেড? এটা না হয় পরেরটা ধরিয়ে দেব। আর দুঘণ্টা পরে।

কিন্তু দূরে শীতের আকাশ জুড়ে ইঞ্জিনের হুইসিল বেজে ওঠে। দৌড়তে দৌড়তে নিজেকে জিজ্ঞাসা করে, সে কি পারবে না, তার বাল্যকাল যৌবন সঙ্গে নিয়ে আগামী কালে দৌড়ে যেতে, আরও চারপাশের জগতে প্রোথিত হয়ে অথচ তাতেই সীমাবদ্ধ না হয়ে?

মদনবাবুর আন্দাজ ঠিক। ট্রেনে ওঠার পরও ট্রেন কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে।

—দেখলেন তো, টেম্‌পো উঠছে। চালিয়ে যান। কোন বাধাকেই গ্রাহ্য করবেন না। টুটুল তার মাথার চুল ঝাঁকিয়ে বললে।

দুই

তিন দিন পর কাটিয়াহাট বা কেটে। বসিরহাটে তপনের সঙ্গে বাস থেকে নেমে গরম সিঙাড়া খেয়ে ঘাটে এসে দাঁড়ায় টুটুল। শীতের রোদ্দুরে ঝকমক করে ইছামতীর জল, ওপারে আকাশের নীচে আখের খেত। খেয়ায় উঠে গলুইতে ছলছল জলের আওয়াজ শুনতে শুনতে টুটুলের মুন্সীগঞ্জের কথা মনে আসে।

—কী রে, কবিতাগুলো আবার মাথায় চাড়া দিচ্ছে বুঝি? তপন তার হলদেটে চ্যাপ্টা চোয়াল আর মোঙ্গোলীয় চোখ দুটোর ওপরে হাত রেখে বললে।

—হ্যাঁ, কবিতাগুলো আবার মাথা চাড়া দিচ্ছে।

ওপারে প্রায় মাইল পাঁচেক রাস্তা। হাঁটতে হাঁটতে গা ঘেমে ওঠে। ঝোলায় কম্বল থাকায় আরও ভারী লাগে। তপনের শরীরটা পাতলা, ছোটখাটো। কিন্তু সেও শ্যাওড়া গাছের ঘন ছায়া আসতেই দাঁড়িয়ে পড়ে। দুজনে থলি রেখে মাটিতে বসে। পাশ দিয়ে দুটো কাঁচাবাঁশভর্তি গরুর গাড়ি আওয়াজ করতে করতে বাঁক নিয়ে মিলিয়ে যায়। দুটো লোক গুড়ের নাগরী মাথায় এদিকে আসছিল। তারাও জিরোয় টুটুলদের পাশে বসে। বিড়ি খেতে খেতে নীচু গলায় আলাপ করে। টুটুল অনেকক্ষণ কান পেতে তাদের কথা বুঝতে চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। বোধহয় কোন অপঘাতে মৃত্যুর কথা তারা আলোচনা করছিল, কিন্তু তা সাপে কাটাও হতে পারে, বাসে চাপাও হতে পারে। তপন হঠাৎ বলে উঠল,—কিগো, এখানে কিসান সভা আছে? তোমরা কিসান সভার লোক?

যেটা বেশী ঢ্যাঙা সে লোকটা দাঁড়িয়ে ওঠে। মাথায় টেড়ি ঠিকমতো পাততে পাততে বলে, —কী বলছো বাবু বুঝি না। আমরা গরিব লোক। লম্বা লম্বা পা ফেলে লোক দুটো মিলিয়ে যায়।

টুটুল সিগারেট ধরায়। সামনের ধানকাটা মাঠের দিকে চেয়ে চেয়ে বলে,—আমার খুব লিখতে ইচ্ছে করে।

—তা লেখ, কে বারণ করছে? তুই এখন লিখলে নিশ্চয় রোম্যান্টিক কবিতা লিখবি না। আমাদের স্ট্রাগলের কথা যদি ভাল করে বলতে পারিস লোকে ঠিক অ্যাকসেপ্ট করবে।

টুটুল আত্মগত ভাবে বললে,—আমি ঠিক ঐ ধরনের কবিতার কথা বলছি না। ঐ রকম আগুনের-ফুলকি-ছিটানো কবিতা, ওগুলোর খুব দাম আছে। কিন্তু আমি চাই অন্যরকম লিখতে। এই আমার চার পাশের মানুষ পাল্টে যাচ্ছে। আমি চাই আমার সময়ের চেহারাটা তুলে ধরতে।

—তুই একেবারে টিপিকাল্। নে, তোর হেঁয়ালি রাখ। আরও দুমাইল যেতে হবে।

এক গা ঘেসে বাঁশঝাড়, বট আর কলাবাগানে ঘেরা গ্রামটায় তারা ঢুকল দুপুরে।

মাথাভর্তি চকচকে টাক আর প্রায় চোখের নীচ থেকে ঠাসাকালো দাড়িতে মুখ, হাঁটু অবধি হড়হড়ে কাদা, হাতে জাল—তায়েব আলি তাদের দিকে মুখ ফেরাতেই তার গন্নাকাটা ঠোঁটের ভেতর থেকে দুটো ঝকঝকে দাঁত তাদের সম্ভাষণ জানায়।

—জাল দিলাম আপনাদের জন্যি। শালারা এমন সেয়ান হয়েছেন। ঐ কয়েকটা ছোট মাছ। কতগুলো খলসে, ল্যাঠা, কুচো চিংড়ি, শুলে একটা ভালায়, এখনও কয়েকটা আঁকপাঁক করছে।

—খুব চলবে, খুব চলবে, টুটুল উৎসাহে চেঁচিয়ে উঠল।

বাড়ির পেছনে ঘন আমবাগানে ঢাকা পুকুর, তিন ভাগ দামে ভরা। তপন চমৎকার কেরদানি দেখালে। ঝোলা থেকে চট করে গামছাখানা পরে নিয়ে চেটোয় সর্ষের তেল নিয়ে নাকের ফুটোয় মাথায় মেখে বুকেপিঠে চাপড়ে ঝপাং করে ঝাঁপ খেলে। একটু ইতস্তত করে টুটুলও তাকে অনুসরণ করলে। কনকনে ঠাণ্ডা স্থির জল যেন চাবুক মারল টুটুলকে। বিকেলে আবার স্থানীয় ইস্কুলে খড়ো চালের হলঘরে বক্তৃতা। আবার বক্তৃতার কল ছেড়ে দেয় টুটুল আর সেই বেগার্ত বাক্যের তোড়ে চারপাশের অন্যায়-অত্যাচার-তাড়িত মাস্টার মশাইরা ওলোট পালোট হন। অর্থনীতি থেকে রাজনীতি, এই পরীক্ষিত রাস্তায় টুটুলের অগ্রগতির সঙ্গে সবাই যে ঠিক তাল রাখতে পারে তা নয়। বিশেষ করে স্কুল-বোর্ডের টালবাহানা, দুর্নীতি, এগুলো যতোখানি বোধগম্য হয় ততোখানি এই সমস্ত ব্যাপারটা বর্তমান ভারতবর্ষের রাজনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে কেন অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত সে কথাগুলো ততো পরিষ্কার হয় না। এবং এই রাজনৈতিক কাঠামটাকে যখন অবিলম্বে ভেঙে চুরমার করার জন্যে টুটুল আহ্বান জানায় তখন কেউ কেউ নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে, নিজেদের মধ্যে নীচু গলায় আলাপের স্বরও আসে। টুটুল বুঝতে পারে না, বোধহয় তার জ্বর আসছে। কিন্তু বোধহয় সেজন্যও তার ভাষা আরও তীব্রতা পায়। মফঃস্বল কোর্টে যেমন দিগ্বিজয়ী ব্যারিস্টার বক্তৃতা করে হাকিমকে শুদ্ধ সমস্ত আদালতকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে তেমনি টুটুল রাজনৈতিকভাবে বিরোধী মাস্টারমশাইদের প্রবলভাবে আচ্ছন্ন করে। দারুণ উত্তেজনার মধ্যে মিটিং শেষ হয়। 'ইনক্লাব জিন্দাবাদে'র ধ্বনিতে বিকেলের বাতাস ভারী হয়ে ওঠে।

সন্ধের পর গ্রুপ মিটিং। সেখানেও বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, ভারতবর্ষের শাসকশ্রেণীর চরিত্র এবং পার্টি-কর্মীদের কর্তব্য ইত্যাদি প্রশ্নে কথাবার্তা শেষ করে। এসব ক্ষেত্রে টুটুল একটা পদ্ধতি নেয় যেটা সে দেখেছে বেশ কার্যকরী। কোন জটিল প্রশ্নকে সে পাত্তা দেয় না; এমনকি প্রশ্নকর্তার বোধশক্তি সম্পর্কে সে সন্দেহ প্রকাশ করে। এ ব্যাপারটা সে তপনের কাছ থেকেই শিখেছে। কিন্তু এই গুরুমারা বিদ্যেয় সে এখন অনেক অগ্রসর। কারণ এসব বাদানুবাদ, সে লক্ষ করেছে, কোনো সিদ্ধান্তে আসতে সাহায্য করে না শুধু ব্যাপারগুলো আরও ঘোলাটে করে তোলে। 'অতো বেশী বুঝবেন না, বেশী বোঝার অনেক বিপদ'—এই ধরনের কথার ঝাপটায় সে প্রতিপক্ষের আক্রমণ সামলাতে অভ্যস্ত। এবং দেখা যায় এভাবে মিটিং পরিচালনা করলে নির্দিষ্ট একটা লক্ষ্যে আসতে সুবিধে হয়। সে সন্ধেবেলাও এক বয়স্ক এবং বিচক্ষণ মাস্টারমশাইকে বললে,—অতো বুঝতে চাইবেন না স্যর। দেশে আরও লোক আছে। বোঝার ব্যাপারটা তাদের উপরেও একটু ছেড়ে দিন।

টুটুলের এ ধরনের ইদানীং ব্যবহারে কেউ কেউ যে আহত হন নি তা নয়। এমন কি তপনও রাস্তায় নেমে তাকে সমঝিয়ে দিতে চেষ্টা করে।—তুই একটু বাড়াবাড়ি করছিস টুটুল। বোঝানোর দায়িত্বটাও তো আমাদের।

টুটুল জবাব দেয় না। অস্পষ্ট শীতের জ্যোৎস্নায় তারা পথ হাঁটে। তায়েব আলির বাড়ির প্রান্তদেশে কলার বনে চাঁদিনী ঝলমল করে। ঢুকতেই গোয়ালের সামনে তায়েব আলির মোষদুটোর পিঠ আলোয় চকচক করে। একসঙ্গে গোবর-চোনার আর গোয়ালের গায়েই ফুটন্ত শিউলিগাছটা থেকে গন্ধ আসে। ম্লান চাঁদনিতেও দেখা যায় শূন্য দাওয়ায় পাটের ফেঁসো উড়ে এসেছে। দাওয়ার নীচেই শুকনো ঝন্‌ঝনে পাটের গাঁট সাজানো আছে, লরির অপেক্ষায়। জ্যোৎস্নায় কাক ডাকে।

একটু লক্ষ করলে নজরে পড়ে চারপাঁচটা ছেলে দাওয়ায় এদিক ওদিক মুড়িঝুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। লণ্ঠন হাতে গোয়াল থেকে বেরিয়ে আসে তায়েব আলি। পা ধুয়েমুছে দাওয়ার কোনা থেকে কতগুলো ছালা এনে বিছিয়ে দেয়। নিজেও বসে।

—আপনাদের কাজ মিটল? কাল চলি যাবেন? তার কথায় খুলনার টান।

—হ্যাঁ, আর থেকে কী লাভ? টুটুল অন্ধকারে সিগারেট ধরায়।

—আপনাদের মনে হয় না কমরেড। আমরা যে জলকাদায় পড়ি আছি সারা বছর······কথাটা জড়িয়ে যায় তায়েব আলির। সমাজব্যবস্থার বিরাট ফারাকে তায়েব আলি আর অনিন্দ্য যে আলাদা, দুজনেই একই রাজনৈতিক পার্টির অংশ হলেও—তা তার আরও বেশী করে মনে পড়ে।

—তাতে কী! গাঁয়ে থাকতে গেলেই জলকাদায় থাকতে হয়। সারাদেশের লোকই থাকছে।

গয়াকাটা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে সামনের দাঁত দুটো ঝলসায় তায়েব আলির।—সেই কথাটাই বলছি কমরেড। আমরা গাই গরু ক্ষেত খামার নিয়ে থাকি। আপনারা লালঝাণ্ডা নিয়ে এলেন আমাদের মধ্যি, তারপর চলি গেলেন। এই কথাই বলে গাঁয়ের লোক। বলে, ওরা কেউ থাকে না।

—থাকার দরকার হলে থাকবে। শহরে বসে তো আমরা ফুর্তি লুটছি না। সেখানেও অনেক কাজ।

—হ্যাঁ, তাই। দীর্ঘশ্বাসের মতো শোনায় তায়েব আলির গলা।

—পাটের দর কেমন এবার? তপন ফস করে প্রশ্ন করে।

—গতবার কতো ছিল জানেন কমরেড? ঠিক কথার পিঠে তায়েব প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়।

—পাট তো এবার ভালই হয়েছে এদিকে? কথার মোড় ফেরাতে সচেষ্ট হয় টুটুল।

—ভাল হয়েই তো সর্বনাশ।

—সরকার থেকে দর বাঁধে নি?

—সে বাঁধলে কী হবে? আমরা তো সব দাদন খেয়ে বসি আছি। ঐ মোষ দুটোই কমরেড বাঁচালি আমাদের। ভাইডা মরল দুবছর আগে। ভাইয়ের বউডারে সাদি করলাম। ঐ শুয়ে আছে, ঐ দুটো ভাইয়ের ছেলে। ওরা দুধ দেয় বাড়ি-বাড়ি।

তায়েব আলি হঠাৎ চুপ করে যায়। চারদিকে নৈঃশব্দ্য তাকে যেন আঁকড়ে ধরছে মনে হয় টুটুলের। গোয়াল থেকে মোষ দুটোর নিঃশ্বাসের আওয়াজ আসে। এতক্ষণে পূর্ণিমার চাঁদ তায়েব

আলির নারকেলগাছটার মাথায় এসে আটকে থাকে। ঠাণ্ডা বাড়ছে।

তায়েব আলির কথা বলতে ইচ্ছে করে—যেমন গাঁয়ের মানুষরা কথা বলে। কিন্তু এই সুদক্ষ তরুণ সহচর দুটির কাছে ঠিকমতো মুখ খুলতে না পেরে আঁকপাঁক করে। অন্ধকারে চাঁদনিতে যেমন জলের আওয়াজ আসে তেমনি গলগল ছলছল করে তায়েব বলতে থাকে,—কাকদ্বীপে ছিলাম কমরেড, কাকদ্বীপে। রহমত আলির বাড়ি, রহমত আমার চাচা। কী কাটাকাটি চলল কমরেড। জোতদাররা ভয়ে কাঁটা। বলে, ধান চাল আপনারা নিয়ে যান। কী জোশ কমরেড! হাজার লোক সড়কি নিয়ে ঝাণ্ডা নিয়ে চলছি আমরা। তেমনটি আর হবে না কমরেড।

—আবার হবে। আরও বড় করে হবে সারা দেশে। ঘুমে জড়ানো গলায় বলে টুটুল।

—নাঃ, সেটি আর হচ্ছি না। আপনারা বললেন, ধান পুড়াও। গোলাকে গোলা ধান দাউ দাউ করি জলল। আমার ভয় হল। আমরা গাঁয়ের লোক, জলকাদায় মানুষ। ধান আমাদের পেটের ছেলের মতো। আমি বারণ করলাম, চাচা বারণ করল। কে কথা শোনে। গোলাকে গোলা জলল। তারপর গাঁয়ের লোকরা বেঁকি বসল। যখন পুলিশ এল পুলিশের সঙ্গে ভিড়ল। আপনাদের ভয় করি কমরেড। আপনারা অনেক বুঝেন। আমাদের গাঁয়ের মানুষের কথাডা বুঝলেন না। আমরা ধানের জন্যি পেটাপিটি করি। রহমত চাচা মারলে পাঁচু মণ্ডলকে। শালা খুনীডারে শেষ করলি। কিন্তু সে রহমত চাচারে তোমরা জানো না। সে লড়াই করে আবার সবাইকে নিয়ে বাঁচে। রহমত চাচা খুব দিলদার লোক। বাড়ি বাড়ি গিয়ে সে খবর নেয়। তোমরা রহমত চাচাকে বুঝলে না। সে এককালে লড়াই করেছে, এখন করে না……

—এখন গেঁজে গেছে, টুটুলের গলায় ঘুমের বদলে প্রবল অসহিষ্ণুতা।

—গেঁজি গেছে! গেঁজি গেছে! হঠাৎ হাত দুটো টুটুলের সামনে তুলে ভেঙায় তায়েব আলি। —আর তোমরা? তোমরা রাজপুত্তুররা?

—এটা কী হচ্ছে কমরেড? কিছু খাবারটাবার থাকে তো দিন। ঘুম পেয়ে গেছে।

তিন

টুটুল কিন্তু খেল না। পাহাড়ের-মতো-চুড়ো-করা মোটা-চালের ভাত আর রকমারি ছোট মাছের আকর্ষণীয় ঝাল পাতেই পড়ে থাকল। লণ্ঠনের আলোয় তার টসটসে লাল মুখচোখ দেখে তপন চমকে ওঠে—তোর যে জ্বর রে।

সে রাত্তিরে হেলে কেঁপে টুটুলের জ্বর এল। তায়েব আলি বিপদে পড়ল। বাড়িতে পুরনো ছেড়া কাঁথা কম্বল যা ছিল তা দিয়েও টুটুলের কাঁপা থামল না। তপন আন্দাজে টের পায়, বোধহয় ১০৫ ডিগ্রী জ্বর। তায়েব আলি সে রাত্তিরেই কলাপাতা কেটে টুটুলের মাথার রেখে জলের ঝারি দিতে থাকে। কিন্তু জ্বরের সঙ্গে ভুল বকা আর মাথাঝাঁকানো সমানে চলতে থাকে। তপন অবাক হয়ে শুনতে থাকে টুটুলের প্রলাপ; জিভে হাড় নেই শালা—জিভে হাড় নেই শালা…ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু, ক্ষুদ্র প্রাণকে তুচ্ছ করবেন না ডাক্তারবাবু।

ভোরে তায়েব আলির সঙ্গে তপন পরামর্শ করে। টুটুল জ্বরে প্রায় অচৈতন্য। ভোর

থাকতেই তায়েব আলি তার মোষের গাড়িতে খড় বিছিয়ে বাখারির ওপর ছালা চাপিয়ে ছই বানায়। তারপর দুজনে পাঁজাকোলা করে তুলে টুটুলকে শুইয়ে দেয়। ইছামতীর ওপর নৌকায় বোধহয় নদীর হাওয়ায় টুটুলের জ্ঞান আসে। তায়েব সঙ্গে সঙ্গে এসেছে। ওপারে বাসে কোণের সীটে টুটুলকে কোনরকমে বসিয়ে বাস ছাড়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকেছে। যাত্রীদের গুঞ্জনের মধ্যে তার হাত তুলে 'আবার আসবেন' চীৎকারে টুটুল তার লাল চোখ মেলে তাকিয়েই আবার চোখ বোঁজে।

শ্যামবাজারে পৌঁছে বাসের মধ্যেই বেহুঁশ টুটুলকে রেখে অনেক ছুটোছুটির পর কিভাবে ট্যাক্সি জোগাড় করে দুপুরে তাদের বালীগঞ্জের বাড়িতে তার সহকর্মীকে তপন এনে তুলল সে এক ইতিহাস।

নীচের তলা থেকে দক্ষিণ-ভারতীয় সঙ্গীতের আওয়াজ ভেসে আসে। কোনরকমে ধস্তাধস্তি করে আধো-অচেতন টুটুলকে দোতলায় তুলে হাঁফাতে হাঁফাতে তপন দেখে বুড়ীকে। বুড়ীর স্কুল আজ ছুটি। ম্যাটিনিতে এলিট সিনেমায় তার প্রিয় নায়ক রবার্ট টেলারের একখানা যুদ্ধের ছবি দেখবার তাল করছিল তার বন্ধু ডলুর সঙ্গে, ঠিক এমন সময়ে এরকম দৃশ্যে সে হাঁউমাউ করে চেঁচিয়ে ওঠে। ভবনাথ শুয়ে ছিলেন। স্বর্ণসুন্দরীর চীৎকারে তিনিও বেরিয়ে এলেন। গত কয়েক বছরে চাঁদির টাক আরও বেড়েছে আর কানের পাশে কয়েকগাছি চুলে পাক ধরেছে। তাছাড়া বিশেষ টোল খায় নি তাঁর চেহারা।

—কী হয়েছে? তপনের দিকে অপ্রসন্নভাবে চেয়ে বললেন।

তপনের ছোটখাটো শরীর। পরিশ্রমে সে হাঁফাচ্ছিল। আস্তে আস্তে বললে,—আমাকে আগে এক গেলাস জল খাওয়ান।

ঢক ঢক করে সমস্ত জলটা খেয়ে তপন দাঁড়িয়ে উঠল। অপরিসীম ক্লান্তিতে হাই তুলে বললে, —কিছু না, জর। কাল সন্ধেবেলা জর এসেছে।

স্বর্ণসুন্দরী কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন, তাঁর ছেলেকে সবাই মিলে মেরে ফেলল, বাপেও শাসন করল না, ইত্যাদি।

—ওকে শুইয়ে দাও, আমি ডাক্তার মুখার্জিকে ডাকছি। ভবনাথ নিজেই বেরিয়ে গেলেন।

তপনের অবস্থাটা অনেকটা সেইরকম অভিনেতার মতো যে তাল বুঝে রঙ্গমঞ্চ থেকে বেরিয়ে যাবার কায়দা রপ্ত করেনি। তাছাড়া সে নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। ভবানীপুরে প্রায় আদিগঙ্গার গায়ে যে জীর্ণ বাড়ির একতলায় সে তার ভাইবোন মা রেলের কেরানী বাবা অধিবাসী, তার সঙ্গে এই ঝকঝকে ছিমছাম মার্বেল মোজেইকের বাড়ির সামান্য সাদৃশ্য নেই। সবচেয়ে তার মেজাজ খারাপ হয় যখন প্রায় নাক চোখ লোমে ঢাকা রেশমী ধূসর বুড়ীর ছোট কুকুরটা এসে তার পা শুঁকতে থাকে। গলাটা যথাসম্ভব বিকট করে সে চেঁচিয়ে ওঠে,—আচ্ছা, আমি চলি। তারপর তড়বড় করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়।

মাঝখান থেকে বুড়ীর ম্যাটিনি শো ফেঁসে গেল।

যে দীর্ঘস্থায়ী স্বপ্নের মধ্যে টুটুল গত দু-তিন বছর ঘুরে বেড়িয়েছে সেই নতুন স্বপ্নের ভারতবর্ষে

অজন্তা ইলোরা তাজমহলের বিশেষ স্থান ছিল না, ছিল এক তীব্র উপলব্ধি আগামীকালের ঐশ্বর্যের, যে কালের নায়ক তায়েব আলি, কলকাতার শহরতলীর বস্তিতে কেরোসিন আর চালের জন্যে রেশান দোকানের সামনে দাঁড়ানো কাতার-দেওয়া মানুষ। এমনকি সে জগতে তার শৈশবে রানাঘাটের মাঠ, মুন্সীগঞ্জে স্টিমারের গলুইয়ে জলের তুবড়ি, সদ্য কলকাতায় আসা নির্জন ঢাকুরিয়া লেকের দুপুরে "গল্পগুচ্ছের" জগৎ—এগুলো সমস্তই অনুপস্থিত। এর সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষার তীব্র ব্যঞ্জনা যা তার কৈশোরশেষে ঝলমল করে উঠেছিল কয়েকটা কবিতায় তাও নিস্তব্ধ। অন্ধকার থেকে তায়েব আলিরা উঠে আসছে, মাটি কাঁপছে, পদধ্বনি প্রতিধ্বনিত আর সেই চরম লগ্ন ত্বরান্বিত করার জন্যে সে সমস্ত আত্মবিস্মৃতির ঝুঁকি নিয়ে পার্টিতে এসেছে, পার্টি তাকে পুনর্জন্ম দিয়েছে। এখানে কোন বিচারের ব্যাপার নেই, ঘটনার বিশ্লেষণ অবান্তর। ঘটনার বিশ্লেষণ করে ক্লীবে পরিণত হওয়ার একচেটিয়া অধিকার তো চোঙাদের। আসলে সব কিছু উল্টেপাল্টে দেবার জন্যে তৈরী হতে হবে। এই বিশাল নৈর্ব্যক্তিক স্বপ্নে বাংলাদেশের আরও অনেক ছেলেমেয়েদের মতো টুটুলও বিভোর হয়েছিল।

ঘুম ভাঙল বিরাট শারীরিক অবসন্নতায়। গত দু-তিন দিন বেহুঁশ অবস্থায় কেটেছে। বসিরহাট থেকে ফেরার পর জ্বর ছেড়ে গিয়েছিল কিন্তু তলপেটে কব্জিতে মুসুরির ডালের মতো লালচে ঘামাচি দেখা দিল। জ্বর ছাড়বার পর চলন্ত বাসে পা তুলতে গিয়ে কাদায় পড়ল দ্বিতীয় পা-টা ঠিক সময় না ওঠায়। কণ্ডাক্টরের দোষ নেই, টুটুল টলমল করে হাঁটছে। সেইভাবে হাঁটতে হাঁটতে বাজারের পাশে ডাক্তার মুখার্জির ডিসপেন্সারিতে গিয়ে উঠল।

ডাক্তারবাবুর বাইরের ঘরে অনেক রুগী। বছর পঞ্চাশেকের এক কালোকুচকুচে ভদ্রলোক তাঁকে বলছিলেন,—মনে করবেন না স্যর, বিনে পয়সায় চিকিৎসে করাচ্ছি। আই হেট্ ইট। শরীরের খাঁচাখানা বিশাল কিন্তু এখন কেমন চামড়া কুঁচকে ঢলঢলে দেখাচ্ছে। আপনাকে আমি খুশি করে দেব। খালি এই পেটের ব্যথাটা।

ডাক্তার মুখার্জীর তাঁর হিটলারি সাদা গোঁফ আর মায়াবী চোখ মেলে একমুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন। আস্তে আস্তে বললেন,—পয়সা দিলেই সব রোগ সারে?

—কেন সারবে না? মেডিকেল সায়েন্স এত অ্যাডভান্সড হয়েছে এতদিকে। আমাদের দেশ কি সব ব্যাপারে ব্যাকওয়ার্ড হয়ে থাকবে?

—মানুষের শরীরের মতো এমন অদ্ভুত জিনিস কিছু নেই। এই আছি···এই নাই। প্রেসক্রিপশান লিখতে লিখতে ডাক্তার মুখার্জী বললেন।

ভদ্রলোক অসোয়াস্তিতে ছলবল করে উঠলেন,—আপনি তো মশাই বড্ড ডিপ্রেস্ করে দিতে পারেন। ডাক্তারের আসল কাজ রোগীদের উৎসাহ দেওয়া।

—মিথ্যে কথা বলা নয়, ডাক্তারবাবু কঠিনভাবে বললেন।

তারপর হঠাৎ মুখ ঘুরাতেই টুটুলের দিকে তাঁর নজর পড়ল। টুটুল তার টলমলে শরীরটা কোনরকমে চেয়ারের সঙ্গে আঁকড়ে দাঁড়িয়ে।

—কী, বিপ্লব শেষ হল? বলে ভাল করে তাকিয়েই চোখ কুঁচকালেন ডাক্তারবাবু।—কী

হল? আবার জ্বর এল নাকি! আমাকে বললেই তো আমি যেতাম।

—ডাক্তারবাবু উঠে টুটুলকে ধরে চেয়ারে বসিয়ে দেন। হাত ছাড়তেই কব্জি চোখে পড়ে। কব্জির ঠিক ওপরেই তিন-চারটে মুসুরির দানা। টুটুলকে শুইয়ে দিয়ে টর্চ ফেলেন তলপেটে। খুব বেশী নয়, সেখানেও কয়েকটা রক্তাভ মুসুরির দানা। গায়ে জ্বর নেই।

—আমার মাড়িটা একবার দেখুন তো ডাক্তারবাবু, বোধহয় দাঁতে ব্যথা। টুটুল হাঁ করে। আবার আলো ফেলেন ডাক্তারবাবু, দুপাটি মাড়ি ফুলে ঢোল। ঠোঁট টানতেই দেখা যায় সরু সরু লাল সুতোর মতো রক্তের ধারা।

—থুতু ফেলো।

টুটুল টলমল করতে করতে উঠে থুতু ফেলে। সাদা ধবধবে বেসিনে রক্তের বাহারে বৈপরীত্য চোখ ধাঁধায়। বয়স্ক ভদ্রলোকটির চীৎকার কানে আসে টুটুলের।

—এ যে গ্যালপিং টি বি মশাই! কী কাণ্ড!

—থামুন! টিবি মানে কী জানেন? রক্ত পড়লেই টিবি, না? চাপা রাগে থমথমে ডাক্তার মুখার্জীর গলা ভেসে আসে।

—আমরা কী জানি মশাই। আমরা লেম্যান।

—এই লেম্যানদের নিয়েই তো মুশকিল। আপনার নিজের সম্পর্কেই তো কিছু জানেন না। কিছু জানেন?

—আপনি মশাই বড্ড ডিপ্রেস্‌ড্ করে দিচ্ছেন। আই হ্যাভ মানি। আপনাকে হয়তো বলিনি, আসানসোলে দুটো সিনেমা হলের প্রোপ্রাইটার আমি।

—তাতে কী?

ভদ্রলোক হঠাৎ করুণ ভাবে হাসেন। মানে, আমি কী বলতে চাচ্ছি জানেন, আমি ঠিক নকরাছকরা নই। বাবা ছিলেন হেডপণ্ডিত, প্রাইমারি স্কুলের মশাই। নেংটাপোঁদে মানুষ হয়েছি। এখন দুটো সিনেমা হল। তাছাড়া চারটে লরি চালাই। বাসের পারমিট পেয়েছি। সব ব্যাপার শুর মানেজ করেছি। এই খালি পেটের ব্যথাটা। বছর দেড়েক হল ট্রাবল দিচ্ছে।...আপনি যা চান আমি তাই দেব।

ভদ্রলোকের কথা শুনতে শুনতে ডাক্তার মুখার্জীর চোখ আরও আয়ত কোমল দেখায়। তিনি যেন আরও কিছু শুনতে পাচ্ছেন যা তাঁর গত তিরিশ বছরের জীবননাট্যে বারবার শুনতে পেয়েছেন। বাস্তবিক মৃত্যু মানুষের এত কাছাকাছি, এত অঙ্গাঙ্গী এবং এত সহজে বিস্মৃত এই সত্য যে মাঝে মাঝে তাঁর নিজের অধীত বিদ্যাটা ঝাঁকি দিয়ে তার অস্তিত্ব প্রমাণ করবার ইচ্ছে হয় তাঁর।

—কিছু ব্যাপার না, একটু অম্বিদে, একটু ব্যথা...

—বুঝেছি।

—এখন সায়েন্স তো অনেক অ্যাডভান্স করেছে। যদি বিদেশ থেকে ওষুধ আনতে বলেন তাতেও রাজী আছি। ডাক্তারবাবু ক্লান্তভাবে আঁচড় কাটতে থাকেন। তারপর কাগজটা সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে বলেন,—এখানে একবার দেখান।

টুটুল আগেও আর্তনাদ শুনেছে কিন্তু এমন প্রবল জান্তব আর্তনাদ শোনে নি। 'এ কী এ কী!' এদুটো কথা যেন ভদ্রলোকের পেটের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে।—ক্যান্সার ইন্সটিটিউট! আপনি ভুল করছেন ডাক্তারবাবু। গ্রেট ব্লাণ্ডার, গ্রেট ব্লাণ্ডার! এই জন্তেই আমাদের দেশে কিছু হয় না।

শান্ত ধীর গলায় ডাক্তারবাবু বলেন,—আপনি ওখানে গিয়ে একবার চেক করুন। আর আমি তো কিছু বলছি না।

—আমি তো বললাম, আই ক্যান সে। বিলিভ মি, আপনাকে আমি বিশ্বাস করি। ওসব ঝামেলায় কেন পাঠাচ্ছেন? যদি ফরেন থেকে ওষুধ আনতে হয়...

আবার হিটলারী গোঁফের ওপর আয়ত কোমল বিপদেভরা চোখ দুটো মেলে চেয়ে থাকেন ডাক্তারবাবু।—ঠিক আছে, আমিই চিকিৎসা করব, কিন্তু একবার চেক্ করিয়ে আসুন।

ভদ্রলোক মোটা মোটা আঙুল দিয়ে একথাবলা নোট বার করেন। সেগুলো থেকে আটটা একটাকার নোট বার করতে গুলিয়ে ফেলেন। আবার গোনেন। টাকাটা টেবিলের ওপর রেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। আধ ঘুমন্ত টুটুলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেন,—কেস্‌টা কী ডাক্তারবাবু? অবশ্য আমরা লেম্যান্, আমরা কী বুঝি!

—এর কেস্‌টা মনে হচ্ছে জটিল। টিবিফিবি নয়। ব্লাডের অসুখ।

—লিউকোমিয়া?

—আপনি যান তো মশাই! আমার সময়ের দাম আছে। যান, যা বলেছি তাই করুন।

ভদ্রলোক আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,—আমরা কী জানি মশাই, আমরা তো লেম্যান।

বোধহয় আসানসোলের এই বয়স্ক ভদ্রলোকটি ডাক্তারবাবুটির সঙ্গে এক নতুন বন্ধুত্ব স্থাপন করতে চান যে মৈত্রী শুধু পয়সায় লভ্য নয়। সেইজন্যেই বেচারী আর একটুক্ষণ থাকতে চাইছিলেন। আর এক বেজারভাবও তাঁকে আচ্ছন্ন করেছিল প্রথম ভয়ের ধাক্কাটা কাটার পর। যেমন সিনেমা-মাদকদের কিংবা ক্রীড়ামাদকদের হয়ে থাকে। অর্থাৎ ঘণ্টার পর ঘণ্টা রোদে জলে লাইনে দাঁড়িয়ে ঠিক যখন টিকিট কাউণ্টার মুখোমুখী, যখন সমস্ত পৃথিবী পায়ের তলায়, সব কেল্লা ফতে, ঠিক সেই সময় নিঃশেষিত টিকিটের দরুন ঝাঁপি বন্ধ। হঠাৎ চোখের সামনে তাঁর জীবনটা বন্ধ হয়ে গেল যখন সবেমাত্র আরও দুটো বাসের পারমিট পাওয়া গেছে।

ভদ্রলোক চৌকাঠ পেরোতেই ডাক্তার মুখার্জী চাপা গলায় বলেন,—পুওর ফেলো, হি উইল লাস্ট অ্যানাদার মান্থ। তারপর স্বগতোক্তি করে চলেন,—আই হেট্ দিজ পিপল্—দিজ সবজান্তাস্! এরা কী মনে করে কী? পয়সা আছে বলে, ক্ষমতা আছে বলে, সব উল্টেপাল্টে দেবে? আর এই সায়েন্স, সায়েন্স! সায়েন্স মানে তো বিনয়, ধৈর্য, সাহস! ফিসিওলজিতে রেকর্ড মার্ক ছিল, বুঝলে টুটুল। পেট খুললেই আমি বিস্ময়ে অভিভূত হতাম—লাইক এ চাইল্ড। মানুষের এই শরীর আর আকাশের এই গ্রহতারকা! একেবারে এক, জানো টুটুল, একেবারে এক! আমরা কতটুকু জানি? অ্যান্টিবায়টিকস্, আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং? কোয়াইট রাইট্। বিজ্ঞানের মস্ত পদক্ষেপ। কিন্তু তার মানে কী? আমরা ভাবব কেল্লা ফতে? অসম্ভব। সোজা রাস্তায় চলেছে, ঠিক হায়। একটু বেঁকেছো কি মরেছো! তখন ব্লাড টেস্ট, ইঞ্জেক্‌শান, এক্সরে, ঘন ঘন ওষুধ পাল্টানো।

টুটুলের দিকে চোখ পড়তেই তাঁর বক্তৃতা বন্ধ হয়ে যায়। নাড়া দিয়ে জাগাতে হয়।—আমার কথা বুঝতে পারছো? ছুটো ইঞ্জেকশান দেব।

—দিন, ঘুমের মধ্যে থেকে টুটুলের জবাব আসে।

একটা ভিটামিন সি আর একটা লিভার এক্সট্র্যাক্ট ইঞ্জেকশান দেন ডাক্তারবাবু। দিতে দিতে বিড়বিড় করেন,—হেমারেজ স্টার্ট করেছে। থি ডেজ অ্যাণ্ড দেন?

ডাক্তারবাবু চাকরকে ডেকে গাড়ি বার করলেন। আপত্তি সত্বেও টলন্ত টুটুলকে গাড়ি তুলে বাড়ি নিয়ে এলেন। বাড়ি এলে টুটুলকে নিয়ে একটা কনফারেন্স বসে গেল। স্বর্ণসুন্দরী ফোন করে আত্মীয়স্বজনের বাড়ি তাঁর এই সর্বনাশের কথা জানালেন। তাঁকে সমবেদনা জানাবার জন্যে দলে দঙ্গলে আসতে আরম্ভ করলে সবাই। লুচির গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে উঠল।

—ছুধ খাওয়ান, ছেলেকে যদি বাঁচাতে চান, খাঁটি ছুধ খাওয়ান বেশী করে। ডাক্তারবাবু বলে গেছিলেন।

স্বর্ণসুন্দরী সমস্ত পাড়ায় জাল ফেলে ছুধ ধরলেন অতিরিক্ত দরে। তাঁর সমস্ত কর্মক্ষমতা টুটুলের অসুখকে কেন্দ্র করে আবার গম্‌গমিয়ে উঠল। অনেক বছর পরেও অনেক চেষ্টা করেও এই সময়ের স্মৃতি ফিরে পায়নি টুটুল। শুধু কাটাকাটা কথা, খাটের বাজুতে পারিবারিক মুখ, হঠাৎ বিকেল আর সন্ধের মাঝামাঝি যখন বারান্দায় ফাঁক দিয়ে অনেক দূরে রক্তাভ আকাশের পটে তেতালা বাড়ির জলের ট্যাঙ্ক আর একটি নিঃসঙ্গ বাঁশের ডগায় লটকানো ঘুড়ির দৃশ্যের ওপর চোখ খুলতেই দৃষ্টি পড়ে টুটুলের ঠিক সেই সময় সে আবিষ্কার করে ভবনাথ ঘাটের বাজু ধরে কাঁদছেন নিঃশব্দে। টুটুল সান্ত্বনা দেবার চেষ্টায় বুঝতে পারে তার মুখ আটকানো, ছুদিন ধরে অসাড়ে রক্ত পড়েছে, দাঁতের গোড়া দিয়ে, সকাল থেকে নাক দিয়েও পড়ছে। টুটুল পরে জেনেছিল, সকালে আবার ব্লাড টেস্ট হয়েছে, ব্লাড ট্রান্সমিউশ্যানের কথা চলছে। আটচল্লিশ ঘণ্টা পরেও রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়নি। এসব কথা সে অনেক পরে জেনেছিল, প্রায় তিন সপ্তাহ পরে যখন সে অনেকটা সুস্থ। কিন্তু তার মাড়ি মুখ অসম্ভব ফোলা। আর বুড়ী সবসময় তার মুখের ওপর। ফিডিং কাপের নল থেকে তরল ছুধ গলায় যাবার স্মৃতিটা তার প্রবল। কিন্তু কথা বলার কোনো উপায় ছিল না। রক্তের চাপড়ায় দাঁত মাড়ি ঢাকা পড়েছে। সন্ধেবেলায় চৌষট্টি টাকার ডাক্তার এলেন—সেইরকম ঝকঝকে ব্যক্তিত্ব যাঁদের গা থেকে করকরে নোটের আওয়াজ ওঠে, আত্মবিশ্বাসের সুরবাহার গলায়। সবে পঞ্চাশ পেরোনো ছোকরা— প্রৌঢ় পাতলা গড়নের ভদ্রলোকটি ছুদিকে হাত ছড়ানো টুটুলের দিকে চেয়ে বললেন,—কী হে, একেবারে যীশুখ্রীষ্ট হয়ে গেছো। কোনো ভয় নেই। ঠিক আছে। মাস্টারমশাই আছেন, ভয় কী?

ডাক্তার মুখার্জীর চিকিৎসাই পুরোপুরি বজায় রেখে কয়েকটা ওষুধ এদিক ওদিক করে দিলেন। পরের দিন রক্তক্ষরণের বেগ ক্রমশ কমে এল। টুটুলের পাশে রাখা প্যান অপেক্ষাকৃত কম রক্তাভ। ডাক্তারবাবু প্রথম দিন থেকেই যা বলে এসেছেন তাই দাঁড়াল ব্লাড রিপোর্টে। রক্তের এক বিশেষ কণিকা ছুলাখের বদলে পঞ্চাশ হাজারে দাঁড়িয়েছে। আর চব্বিশ ঘণ্টা রক্তক্ষরণ হলে টুটুলের পরলোকপ্রাপ্তি আশ্চর্য ছিল না।

খুব ধীরে ধীরে আরোগ্যের পথে যাত্রা। আর এ যাত্রায় তার সর্বক্ষণ সঙ্গী ছিল বুড়ী।

সমস্ত ব্যাপারে থাকলেও কোন এক বিশেষ ব্যাপারের খুঁটিনাটির সঙ্গে একনাগাড়ে লেগে থাকার ধৈর্য স্বর্ণসুন্দরীর নেই। বিশেষ করে যেসব ব্যাপারে হাঁকডাক নেই উত্তেজনা নেই, সেই নিস্তরঙ্গ রুটিনে সময়ের জল কেটে কেটে তিনি অস্থির হয়ে পড়েন। বুড়ী কিন্তু এ ব্যাপারে মায়ের উল্টো। হাঁকডাকের মধ্যে সে নেই, উত্তেজনা তাকে সিঁটোয়। টুটুলের পার্টির ব্যাপার চেঁচামেচি হট্টগোল, পুলিসের লাঠির বাড়ি তাকে খুব অভিভূত করেনি। এ যেন চারপাশের কোরাসের অঙ্গ, তার ভাইও এ. কোরাসে যোগ দিয়েছে। কিন্তু তার রক্তের এই গুণগত পরিবর্তন, এই নিঃশব্দ অন্তর্লীন বিপ্লব, তাকে আকর্ষণ করে। এই জীবনমৃত্যুর দোলায় সে শুধু টুটুলকেই দেখে নি, টুটুলের সঙ্গে সঙ্গে তার নিজের বাল্যকাল, জলপাইগুড়িতে প্রাইভেট টিউটারের সঙ্গে প্রথম প্রেম, বলতে গেলে গত দশ-পনেরোটা বছর উথলে উঠেছে। ঘড়ি ধরে প্রত্যেক ওষুধ খাওয়ানো, ফিডিং কাপে ঘন ঘন দুধ, স্প্রে করে পেনিসিলিনের ধারায় মুখের ভেতর সাফ, গা মোছানো, জামা পাল্টানো, সবকিছু সে প্রায় একাই করেছে। কারণ যখন ফাঁড়া কেটেছে, যখন হাড়ের আঙুলে মৃত্যু আর কড়া নাড়ছে না, তখন স্বর্ণসুন্দরী তাঁর স্বাভাবিক হাঁকডাকের সংসারে ফিরে গেছেন।

একুশ দিন পর বিশাল দাড়ি ফেলতেই একেবারে অন্যমুখ বেরিয়ে এল টুটুলের। ছোট তীক্ষ্ণ তরুণ মুখখানা আয়নায় দেখে নিজেই অবাক হল।

—একেবারে চিনতে পারছি না, বুড়ীকে বললে।

—হ্যাঁ, তুই একেবারে নতুন। নতুন করে ভাব।

—বুঝেছি। ডলুকে ছেড়ে এখন বুঝি···

বুড়ী জবাব দেয় না, তার ঠোঁটের দুপাশে চাপা কৌতুকের রেখা।

—আন্দাজে ঢিল মারছিস?

—আন্দাজ প্রায় সময় লেগে যায়। যেমন ধর ডলু। তোর ওকে বেশ খানিকটা পছন্দ, কিন্তু ডলুর মা, ওর বাড়ি, তোর অপছন্দ। ঠিক কিনা?

—বেশ জ্যেঠামশাইয়ের মতো কথা বলছিস টুটুল। অবশ্য তুই ছেলেবেলা থেকেই জ্যাঠা। রানাঘাটে তোর চীৎকার এখনও ভুলিনি—ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু, ক্ষুদ্রপ্রাণকে তুচ্ছ করবেন না।

চুপ করে থেকে বলে একটু সতর্কভাবে—জানিস টুটুল তোকে বুঝি না, চোঙাকে অনেকটা বুঝি। চোঙা রিয়ালিস্ট। ও যা চায় সে সম্পর্কে স্পষ্ট একটা ধারণা আছে। কিন্তু তোর কমিউনিজম, তোর কবিতা, সত্যি বলছি, আমার কাছে বড্ড ধোঁয়াটে লাগে। চোঙা আর তুই একেবারে আলাদা। চোঙা ভাবছে যাকে বিয়ে করবে তাকে ভালবাসার জন্যে নয়, এটা আমি জানি। চোঙা বিয়ে করছে তার কেরিয়ারের জন্যে। চোঙা আরও উঠতে চায়, ও আরও উঠবে। কিন্তু তোকে একদম বুঝি না। তুই যে কখনও বিয়েথাওয়া করবি, সংসার করবি, চাকরিবাকরি করবি, আর পাঁচটা মানুষের মতো ঘুরে বেড়াবি—মনেই হয় না।

—দিদি, তুই বড্ড পিসীমাদের মতো কথা বলছিস।

—আমি জানি, তুই এইরকম বলবি। কিন্তু সবাই তো ঠেকে শেখে। বাবার দেখছিস তো?

—এই দেখলি। একেবারে পিসীমাদের মতো। ওসব বাবা মা আমাকে কেন বলছিস?

ওরকম বলা একটা রেওয়াজ। আসলে ব্যাপারটা মোটেই ইকনমিক নয়। আমাদের সংসার মোটামুটি সচ্ছল। আমি বড় চাকরি করি না-করি, তাতে কিছু আসবে না। বাবার পেনশানের টাকা আর বাড়িভাড়া···

—টুটুল, তুই আরও একটু অন্যরকম হলে পারিস। এই একধরনের মেকানিকাল কথা আমাকে শোনাস না। সত্যি করে বল তো কী চাস? তুই যে একটা কট্টর নেতা হবি, অ্যাসেম্ব্লি পার্লামেণ্টে চেঁচামেচি করবি সেরকম তো মনে হয় না।···আর তাছাড়া তোদের তো শুনছি সব আবার ওলোটপালোট হয়ে গেল। সশস্ত্র সংগ্রামটা মুলতুবি থাকল শুনছি?

—তুই তো সব খবরই রাখিস। আমি এটুকু বলতে পারি, যেরকম চলছি সেরকমই চলব। নেতা হব না।

—তুই বিলেত চলে যা টুটুল। আবার নতুন করে একটা জীবন শুরু কর।

টুটুল হেসে বললে,—সেটা এই কলকাতায় বসে হয় না? আমি তো তাই চাই। আবার নতুন করে শুরু। কিন্তু বিলেত আমেরিকা গিয়ে নয়, কোনো বাঁকাপথে সটকানো নয়।···আমি এখানেই থাকব। এই স্লোগান চেঁচামেচি ধুলো ধোঁয়া পুলিশের সঙ্গে লাঠালাঠি, এই ট্রামে বাসে অবিশ্রাম ঝগড়া—এখান থেকে নড়ব না। এই দেশ, এই মানুষ—এখানেই খাড়া দাঁড়িয়ে থাকব।

—কী জানি! বুড়ী দীর্ঘশ্বাস ফেলে,—তোর বোধহয় খুব সাহস। কিন্তু আসলে হয়তো তুই বোকা।

—হয়তো! টুটুলের অস্ফুট জবাব আসে।

[ক্রমশঃ]

অসীম ধারার কূলে

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

গীতাঞ্জলি সম্বন্ধে তিনটি উক্তি স্মরণ করে এই আলোচনার মুখপাত করা যাক। একটি হল বুদ্ধদেব বসুর অ্যান্ একর অব্ গ্রীন্ গ্র্যাসের মন্তব্য: মূলে ছিল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ছন্দবিন্যাস, সুইনবার্নকে ছাড়িয়ে যাওয়া মিলের ঝঙ্কার, কিন্তু এইসব কারুকর্ম থেকে রিক্ত বলে কবিতাগুলিকে ইংরেজিতে আরো শান্ত মনে হয়, আরো অনুগত যেন, একেবারে পরম সমর্পণে বিনম্র। বাংলাতে যেন গীতের অংশ বেশি পাচ্ছি, আর ইংরেজিতে অঞ্জলিটাই প্রায় সর্বস্ব।…এমন মুহূর্ত বিরল নয়, যখন অনুবাদ মূলকে অতিক্রম করে যাচ্ছে।[১] আমি স্মরণ করি টমসনের অভিমতটি: ইংরাজি গীতাঞ্জলি প্রকৃত প্রস্তাবে একটি নতুন কাব্য। আর স্মরণ করি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের দুটি প্রবন্ধের দুটি মন্তব্য। 'ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে তিনি বলেন, " 'গীতাঞ্জলি'তে ভাষার প্রকৃতি সম্বন্ধে গবেষণা চুকিয়ে 'বলাকা'য় তিনি ছন্দের স্বরূপ-সন্ধানে নামলেন' "। এবং 'সূর্যাবর্ত' প্রবন্ধে তিনি বলেন, "বাংলার ইতিহাসে 'মানসী'-ই অপূর্ব নয়, 'গীতাঞ্জলি'-তে মধ্যযুগীয় ভক্তিসাধকদের প্রতিধ্বনিও অনুরূপ অনুভূতির আবশ্যিক অভিব্যক্তি।" সুধীন্দ্রনাথের কথা দিয়েই শুরু করা ভালো। কেননা, তাহলেই বোঝা যাবে গীতাঞ্জলি-র কবি কী অর্থে এক সুমহৎ আধুনিক কবি। 'ভাষার প্রকৃতি সম্বন্ধে গবেষণা' নিশ্চয় মধ্যযুগীয় ভক্তিসাধকদের সাধ্য বিষয় ছিল না। প্রকাশকে 'বিশেষের আততিতে' বাঁধতে চাওয়া, বা 'কাব্যশরীরের সজ্ঞান নির্দিষ্টতা' (বিষ্ণু দে / একালের কবিতার ভূমিকা) যদি আধুনিক কবিতার লক্ষণ হয়, তাহলে রবীন্দ্রনাথের গান কবিতা-অর্থেই আধুনিক কবিতা। সেও এক কথা-স্রোতের সম্প্রসারণ অথবা গভীরগমন। বহুক্ষেত্রে পুনর্লিখনেই তার প্রতিষ্ঠা ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনের গানের কবিতায় গীতাঞ্জলির আগে এবং পরে, জীবনের শেষ প্রান্ত অবধি।

বিষয়টি স্পষ্ট হয় রবীন্দ্রনাথের এই উজ্জ্বল কবিতাটিকে ধরলে, 'মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ আসিতে তোমার দ্বারে'। ১৩৪২এর শ্রাবণে লেখা যে কবিতাটির এটি পাঠান্তর সেটি হল, 'মনে হল পেরিয়ে এলেম অসীম পথ আসিতে তোমার দ্বারে'। উপাদানের দিক থেকে দুটি কবিতাকে এক কবিতা বলা গেলেও, শিল্পের বিচারে এরা সম্পূর্ণ আলাদা। শেষোক্ত কবিতার শেষ পংক্তিটি হল, 'আমার আঁখি ব্যাকুল পাখি ঝড়ের অন্ধকারে', কেবলমাত্র একটি কবি-সম্ভব উক্তি। কিন্তু প্রথম উদ্ধৃত কবিতাটির শেষ পংক্তি একটি অসংশয়ী কবিতার শেষ গূঢ় পদক্ষেপ, 'আমার এ আঁখি উৎসুক পাখি ঝড়ের অন্ধকারে'। এই অসামান্য চিত্রকল্পটির চরণে পৌছতে পৌছতে কবিতাটিও যেন হয়ে ওঠে 'অন্তবিহীন'। 'অসীম' 'অন্তবিহীন' হলে কী হয়, এ যিনি জানিয়ে দেন আমাদের, তিনি কবিতাই লিখছেন—আধুনিক কবিতা। 'সুধাশ্যামল' বড্ড বেশি কবিতা, 'সুধাশ্যামলিম' বর্ণের দিক থেকে সংযত, শব্দের দিক থেকে, দুটি 'ম'-এর সাহায্যে, কোমলতাসঞ্চারী। মূল কবিতায় 'তোমার প্রদীপ' পাঠান্তরে 'নিভৃতে প্রদীপ'।

---

১ "কবি রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থে বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা সমীচীন মনে করি এই প্রসঙ্গে তাঁর আর একটি মন্তব্য: আমার ধারণার কিছু পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু এই মন্তব্যের সঙ্গে এখনো আমি অংশত একমত।

'পথহারার বেদন বাজে সমীরণে' কবিতার রভসে এলিয়ে পড়ছে। পক্ষান্তরে 'পথহারানোর বাজিছে বেদনা সমীরণে' অনেক বেশি বিশেষিত। এরকম ব্যাপার আরো ঘটেছে। সানাই কাব্যগ্রন্থের 'বাণীহারা' কবিতাটির কথা ধরা যাক। গীতবিতানের 'প্রেম' অধ্যায়ের ২২৬ সংখ্যক গান। এখানেও উপাদান একই, কিন্তু প্রথমটিকে যদি বলি কথার শেষ সীমা, দ্বিতীয়টি তবে নীরবতার প্রারম্ভ। প্রথমটির কবিতা-স্বরূপে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু দ্বিতীয়টিতে সব প্রশ্নই বিস্মৃত হতে হয়। 'ওগো মোর নাহি যে বাণী',— 'বাণীহারা' কবিতার এই প্রথম চরণ গানটিতে হল 'বাণী মোর নাহি'। 'ওগো' এবং 'যে' সরে গেল। 'বাণী' আগে চলে আসায় 'নাহি' দিল চরণান্তিক এক বিষন্ন প্রতীক্ষা। সানাইয়ে দ্বিতীয় চরণটিতে একটি 'আকাশে'-র মতো দীর্ঘস্বরবিশিষ্ট শব্দ। গীতবিতানে 'স্তব্ধ' কথাটি বসিয়ে ব্যাপারটিকে আরো সচেতনতা দেওয়া হল। সানাইয়ে কবিতাটির তৃতীয় চরণে 'আমি অমাবিভাবরী আলোকহারা' গীতবিতানে প্রায় একই আছে, 'আমি অমাবিভাবরী আলোহারা'। কিম্বা, এক নেই। 'আলোকহারা' কেন জানি না একটা সাময়িক অবস্থাকে বোঝায়—'আলোহারা' একটা একান্ত মন্ময় অনুভূতিকে ধরে দিচ্ছে। সানাইয়ে 'মেলিয়া তারা' গীতবিতানে হয়েছে 'মেলিয়া অগণ্য তারা'। 'অগণ্য' প্রয়াসের অন্তহীনতার সাক্ষ্য। গুরু পরিবর্তন হয়েছে পরের দুই পংক্তিতে। 'চাহি নিঃশেষ পথ-পানে / নিষ্ফল আশা নিয়ে প্রাণে'-- সানাইয়ের 'বাণীহারা' কবিতার এই দুই পংক্তি গীতবিতানে সংহত হয়েছে একটি পংক্তিতে, 'নিষ্ফল আশায় নিঃশেষ পথ চাহি'। বলে দিতে হয় না, এই সংহতিই সমস্ত বেদনাকে দিয়েছে ঘনতা। 'বাণীহারা' কবিতায় শেষ পাঁচ পংক্তি গীতবিতানে ২২৬ সংখ্যক প্রেম অধ্যায়ে তিন পংক্তিতে পরিণত। সন্দেহ নেই সংহতিতে, কিন্তু আমার আজো ধারণা কবিতার বিচারে 'বাণীহারা'র সমাপ্তি আরো ব্যঞ্জনাবহ। গীতবিতানের কবিতাটিতে আভোগ অংশে শেষ তিন পংক্তিতে পাই—তোমারি সুরের প্রতিধ্বনি তোমারে দিই ফিরায়ে / কে জানে সে কি পশে তব স্বপ্নের তীরে / বিপুল অন্ধকার বাহি॥ অথচ 'বাণীহারাতে' ছিল, তোমারি সুরের প্রতিধ্বনি / দিই যে ফিরায়ে / সে কি তব স্বপ্নের তীরে / ভাঁটার স্রোতের মতো / লাগে ধীরে, অতি ধীরে। শেষোক্ত উদ্ধৃতিটি যা বলবার নিজেই বলেছে। সে কবিতার মতোই স্বয়ংভাব। প্রথম উদ্ধৃতিটি অত কথা বলেনি। বুঝি অন্য কারো কাছে তার কোনো ভরসা আছে।

হয়তো আমার এত কথা বলার দরকারই ছিল না, অভিজ্ঞ রবীন্দ্রপাঠক মাত্রেই জানেন যে, এক ফর্ম থেকে রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর কোনো উপাদানকে নিয়ে যেতেন অন্য এক ফর্মে, তখন এমন ব্যাপার, এমন রদবদল, নেওয়া-ছাড়া, যোগবিয়োগ বহুভাবে ঘটেছে। 'পরিশোধ' কবিতা এমন ভাবেই হয়েছে 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য, চিত্রাঙ্গদা কাব্যনাট্য রূপ পাল্টেছে নৃত্যনাট্যে, রাজা ও রাণী গদ্য সংলাপের তপতী-তে ভিন্নতা পেল। আরো স্মরণ করতে পারি চণ্ডালিকা-র রূপ-ফের। এ শুধু নিখুঁত হবার প্রচেষ্টাই নয়, এভাবে ফর্মের রূপান্তর যিনি ঘটান, তিনি জানেন ফর্মটাই কন্টেন্ট। ফর্ম পাল্টালে বিষয়ার্থও নতুন আলোক পায়। এই কথা মনে রাখলে কিন্তু বাংলা গীতাঞ্জলি এবং ইংরাজি গীতাঞ্জলি-র প্রভেদকে আর মূল ও অনুবাদের সমস্যা বলে ভাবাটা অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে না। সেও ছিল আসলে এক উপাদানকে এক ফর্ম থেকে অন্য ফর্মে সঞ্চারণের সমস্যা। এই ফর্ম বা রূপ সম্বন্ধে তাঁর সচেতনতা, আসলে তাঁর একধরনের আত্মসচেতনতাই।

এবং বাংলা গীতাঞ্জলি-র ভাষার প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর যে-অন্বেষা তা কীভাবে তাঁর আত্মসম্বিতের অবৈকল্য সন্ধান, ইংরাজি গীতাঞ্জলিতেই সেই অন্বেষা পুনরায় কোন্ রূপাশ্রয়ী, তার উপলব্ধিও বিশেষ করে উপভোগ্য। মধ্যযুগীয় ভক্তিসাধকদের সঙ্গে গীতাঞ্জলির লেখকের পার্থক্য গীতাঞ্জলির ভাষার মধ্যেই মূর্ত। এ ভাষা একান্তভাবেই ব্যক্তিক শুধু এই কারণেই একথা বলা নয়, এ ভাষা বিংশশতাব্দীর আধুনিক মানুষের অস্তিত্বগত বিরোধে-মিলনে সকল সময়েই দুই ছায়া-বিশিষ্ট, অর্থন্যাস এখানে সোপান-পরম্পরায় গভীরগামী। রোথেনস্টাইন যতই এতে অতীন্দ্রিয়তার আভাস পান, এজরা পাউণ্ড দেখুন 'প্রাচীন গ্রীস,' আমাদের কাছে এ আধুনিক ভারতবর্ষ। 'কান্না-সাগর', 'বুকের পাথর', 'অরূপতন', 'সোনার থালায় সাজার আজ দুখের অশ্রুধার', 'নিশার মতো নীরব', 'তিমির অবগুণ্ঠন', 'বিরামহীন বিজুলিঘাতে' প্রভৃতি সংখ্যাগণনার অতীত শব্দগুচ্ছের surface structure-এর ফাঁকে ফাঁকে ধ্বনিত হয় এক ব্যক্তির যন্ত্রণার বাণী। এই গূঢ়-গঠনের সেটাই বৈশিষ্ট্য। সঙ্গে সঙ্গে বাংলা কথ্যরীতিতে যে টান, সেই টানেই অব্যয়ের বিচিত্র প্রয়োগ 'কি' 'যেন' 'যে' ইত্যাদি ; 'করে' এই ক্রিয়ার ব্যবহার (আঁধার করে আসে), নেতিবাচক বাক্যের কৌশল, বিরোধ অলঙ্কারের হরণ পূরণ—সবই এক বিশেষ প্রকাশরীতি। শাব্দ-অবয়বে এবং আর্থ-অবয়বে সাযুজ্য বৈষ্ণবপদেও লভ্য—'হামার দুখের নাহি ওর' পদটি স্মরণ করি। কিন্তু 'গীতাঞ্জলি'-কবিতার, রবীন্দ্রনাথের অনেক সেরা গানের কবিতার, কবিতা হিশাবেই, ফোনেটিক স্ট্রাকচার ও ধ্বনি-বর্ণের প্রয়োগ পৃথক আলোচনার দাবি রাখে। 'জীবন যখন শুকায়ে যায়' এই বিখ্যাত কবিতাটি এবিষয়ে অন্যতম সাক্ষ্য দিতে পারে। 'এসো' এই কবিতায় পাঁচবার ধ্বনিত হয়েছে। 'করুণাধারায় এসো', 'গীতসুধারসে এসো', 'শান্তচরণে এসো', 'রাজ-সমারোহে এসো' এবং 'রুদ্র আলোকে এসো'। প্রথম চরণের দ্বি-দল, ত্রিদল শব্দগুলির পরে 'করুণাধারায়' সহসা নেমে আসে আষাঢ়ের প্রত্যাশা পুরিয়ে তৃষিত মৃত্তিকায়। অভিভূত হয়ে যেতে হয়। একটু অবকাশ দিয়েই 'গীতসুধারসে' আরো গুরু, আরো ঘন—'ত' নিশ্চয় স্বরান্ত উচ্চারণেই পড়তে হবে।[২] অথচ 'হৃদয়-প্রান্তে হে নীরব নাথ' মহাপ্রাণ বর্ণগুলিতে ধৃত রইল একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস—তারপরই 'শান্তচরণে' মাত্রাগুণে ছয় পেলেও 'গীতসুধারসে'র মতো সেখানে বিলম্বিত লয়ের, দীর্ঘস্থায়িত্বের প্রয়োজন হবে না[৩]। তৃতীয়াংশে চতুর্থ আহ্বানের উপস্থাপনাটি আরো উপভোগ্য। 'দুয়ার খুলিয়া হে উদার নাথ' দীর্ঘস্বরধ্বনিগুলি যেন উদাত্ত আহ্বানের সূচক, তারপরেই 'রাজ-সমারোহে এসো', আর একটি দীর্ঘ-লয়ের শব্দ। শেষ আহ্বানটিতে[৪] 'ওহে পবিত্র, ওহে অনিদ্র' দুটি যুক্তব্যঞ্জনই চূড়ান্ত আবির্ভাবের ভূমি প্রস্তুত করল, তার পরেই 'রুদ্র'-এর মতো কঠিন ব্যঞ্জন ও যুক্ত ব্যঞ্জনের উচ্চারণ। ভাবের অখণ্ডতা, শব্দের নাটকের মাধ্যমে এক গভীর বিস্ময়বোধ সৃষ্টি করে এই কবিতায়। এটা মধ্যযুগীয় অন্বিষ্ট ছিল না।

এমন ভাবসংহতি, এমন পিনদ্ধতা সর্বত্র রক্ষিত হয়েছে, এমন কথা বলতে পারলে ভাল হত,

২ ও ৩ ইংরাজি গীতাঞ্জলিতে 'when the heart is hard', মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনি এই দীর্ঘশ্বাসকে কবিতাটির প্রথমেই নিয়ে আসে। 'নীরব নাথ' আর lord of silence কিন্তু দুটো আলাদা কথা। lord of silence অন্তত ইংরাজ পাঠকের কাছে ডেভিডের Psalms-এর অনুষঙ্গেই অনর্থক হয়ে উঠবে—O Lord, my rock, be not silent to me : lest, if thou be silent to me, I become like them that go down into the pit.

৪ ইংরাজিতে thy light and thy thunder পুনরায় বাইবেলীয় ঈশ্বরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

কিন্তু তা বলা যায় না। বিখ্যাত কবিতা—'আর নাইরে বেলা নামল ছায়া ধরণীতে।' অনবদ্য এর প্রথম স্তবকটি। রণিত ব্যঞ্জনধ্বনির অব্যর্থ সমাবেশে জলের শব্দই যেন উছলে উঠেছে। সংবৃত স্বরধ্বনি ঐ রমণীর ত্বরাকে ফুটিয়ে তুলেছে নিমেষে। কিন্তু সঞ্চারী অংশে হঠাৎ কবিতাটি তার কাব্যিক বাস্তবতা, যথাযথতা হারিয়ে ফেলেছে। 'প্রেমনদীতে উঠেছে ঢেউ' একথা উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে উড়ে যায় ছায়ার ফাঁকে ফাঁকে দেখা প্রত্যক্ষের নদীটি। 'জানি নে আর ফিরব কিনা' এই উক্তিটির সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নিল কবিতা। তারপর 'সেই অজানা বাজায় বীণা'-র রেশ ধরে কবিতাটি একেবারে হারিয়েই গেছে। উল্টো ব্যাপারটা ঘটেছে 'আজি শ্রাবণ-ঘন-গহন-মোহে' কবিতাটিতে। কবিতাটি সুরেশ সমাজপতিকে ধরা দেয়নি, মুগ্ধ করেছে বুদ্ধদেব বসুকে। এ শুধু শতাব্দীর দুই প্রান্তের রুচি-বলয়ের পার্থক্যই নয়, দুই বোদ্ধা ও বোধভূমির পার্থক্যও বটে। বুদ্ধদেব বসু কবিতাটির প্রশংসায় যা বলেন তা অবশ্যই বহুমান্য। কিন্তু আর-একটা বিপরীত বক্তব্যের বিষয়ও বিবেচ্য। কবিতাটির প্রথম অংশে কবি তাঁর অন্য দু-একটি কবিতার মতোই নিজের তৈরি শব্দের প্রেমে পড়ে পথ হারিয়েছেন। প্রথমাংশে কবিতাটি তিনবার লক্ষ্যভ্রষ্ট, খঞ্জ হয়েছে। দ্বিতীয় পংক্তিতে 'গোপন' শুধু নিরর্থক নয়, ব্যর্থ। যাঁকে উদ্দেশ্য করে কবিতাটি বলা, রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠকেরা, তাঁর কার্য-কলাপের ধারার সঙ্গে পরিচিত বলেই জানি, কোনো 'মোহে'-র উপর তিনি যদি চরণ ফেলেন তবে তাতে কোনো গোপনীয়তা রাখার পক্ষপাত তাঁর থাকে না। মোহকে তিনি জ্বালিয়ে দেন, বা চূর্ণ করেন। 'নিশার মতো নীরব' যদি হয় তাঁর পদসঞ্চার, তাহলে আর 'বাতাস বৃথা যেতেছে ডাকি' বলার দরকার করে না। নবজাতক বইয়ের রাতের গাড়ি কবিতার চতুর্থ পংক্তিতে 'রজনী নিঝুম'-এ 'নিঝুম' শব্দটি এই কারণেই আমার কাছে ব্যর্থ। রেলগাড়ি যেখানে চলিষ্ণু, 'নিঝুম' সেখানে কিছু হতে পারে না। এখানে 'শ্রাবণ-ঘন' কবিতায় তবু পংক্তিটি বেঁচে যায় 'প্রভাত আজি মুদেছে আঁখি' এই পূর্বপংক্তিটির জন্য। কিন্তু কিছুতেই বাঁচে না 'নিলাজ নীল আকাশ ঢাকি নিবিড় মেঘ কে দিল মেলে' এই বাক্যের 'নিলাজ নীল' বিশেষণ-চিত্রটি। নিবিড় মেঘে যে-আকাশ প্রথম থেকেই ঢাকা, তার জন্য 'নীল'-বিশেষণটিই বাহুল্য, 'নিলাজ নীল' বাহুল্যেরও বাড়াবাড়ি। তবে 'নিলাজ নীল' -এর ইংরাজিতে 'ইম্‌প্রুডেন্ট ব্লু' হলে যে একই ভুল হয়ে যায়, অন্তত কবি তা ঠিকই বুঝেছিলেন। তাই তিনি ইংরাজি গীতাঞ্জলিতে নিলাজ নীলকে বাদ দিয়ে ever wakeful blue skyকে ডেকেছেন। তাতে কবিতা আরো ক্ষতিগ্রস্ত হল। ever wakeful অতন্দ্র প্রতীক্ষার ছবি হয়ে উঠতে চায় গীতাঞ্জলির নিজস্ব লজিকে, তাহলে তাকে আর thick veil-এ ঢেকে দেওয়া কেন ? দুবার খুঁড়িয়ে হেঁটেও কবিতাটি কিন্তু সঞ্চারী আভোগ অংশে আশ্চর্য গতি পেল। মুহূর্তে স্পষ্ট হয়ে উঠল কবিতাটির বক্তা। যে-কোনো ঈশ্বর-নিবেদনেই স্পষ্ট হবে ভক্ত। এজাতীয় কবিতার রহস্যই তো এই। এখানেও 'দুয়ার দেওয়া সকল ঘরে' এবং 'রয়েছে খোলা এ ঘর মম' এই দুই উক্তির সমাহারে চির-প্রতীক্ষার একাকিত্ব ধ্বনিত হল। তারপরে 'কবি রবীন্দ্রনাথ'-লেখকের রসগ্রাহী ব্যাখ্যা তো আমাদের মনেই আছে। সে ব্যাখ্যায় সানন্দ সায় দেওয়ায় রসিকেরই তৃপ্ত দায়িত্বমোচন।

গীতাঞ্জলির মূল সুর প্রতীক্ষা, একথা তো আমাদের জানাই। তাই কবিতাগুলি অন্তরে বাইরে একটা যোগসূত্র পেল কী করে এ উত্তর খুঁজতে বেশি বেগ পেতে হয় না। যেমন ধরা যাক পাঁচটি

কবিতা: ১৬ (মেঘের পরে মেঘ জমেছে), ১৭ (কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো), ১৮ (আজি শ্রাবণ-ঘন-গহন-মোহে) ১৯ (আষাঢ় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল) এবং ২০ (আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার) একই অনুভূতি ও আবেগের মূর্তি। পাঁচটি কবিতাতেই গাঢ় হয়ে আছে মেদুর আঁধার। একটিতে প্রভাতের উল্লেখ আছে, আর একটিতেও দিনের দীর্ঘতার কথা বলা হয়েছে—'কেমন করে কাটে আমার এমন বাদল বেলা'। কিন্তু উপরিতলের গঠনে যাই হোক, গভীরের গঠনে পাঁচটি কবিতাই রাত্রির নিঃসঙ্গতার বার্তা বহন করছে। ১৬ সংখ্যকে যার শুরু, ২০ সংখ্যকে তা চূড়ান্ত কাব্যসীমা পেরিয়ে গেল। 'বাতাস' পাঁচটি কবিতাতেই হাজির। যাঁরা বলেন রবীন্দ্রনাথ একধরনের উপাদান বা প্রসঙ্গ প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ব্যবহার করেছেন, তাঁরাও নিশ্চয় জানেন গুটি কয়েক উপাদানই প্রয়োগের বৈচিত্র্য পেয়ে সহস্রবিধ হয়ে ওঠে। 'পরান আমার কেঁদে বেড়ায় দুরন্ত বাতাসে' বা 'ডাকিছে মেঘ হাঁকিছে হাওয়া' অথবা 'বাতাস বৃথা যেতেছে ডাকি' কি, 'সজল হাওয়া যূথীর বনে' কিম্বা, 'আকাশ কাঁদে হতাশ সম' কবিতার দিক থেকেই, ছন্দোগত ধ্বনি হিশাবে, metrical sound হিশাবেই এরা পৃথক পৃথক ব্যঞ্জনা ছড়ায়। 'পরান আমার কেঁদে বেড়ায় দুরন্ত বাতাসে' প্রতীক্ষা এখানে অধৈর্যে কম্পমান। 'ডাকিছে মেঘ, হাঁকিছে হাওয়া' প্রতীক্ষার অধীর অবসান। 'বাতাস বৃথা যেতেছে ডাকি' প্রতীক্ষার প্রার্থী-মূর্তি। 'সজল হাওয়া যূথীর বনে' শুধুই আবেদনময়। কিন্তু 'আকাশ কাঁদে হতাশসম' এখানে প্রতীক্ষা অসীমে ছড়িয়ে গেল। ১৬, ১৮, ১৯, ২০-সংখ্যক কবিতার প্রথম পংক্তিগুলির ধ্বনি-বর্ণও অনুভবের যোগ্য। 'ঝ' 'ধ' 'ঢ়' 'ভ' 'ঘ' এক ধূসরতাকে ঘনিয়ে তোলে। প্রতীক্ষার সেই ধূসর সান্ধ্য বা নৈশ নিঃসঙ্গতার পটে, তারপরে, বর্ণলেপ শুরু হয়। ব্যক্ত হয় ব্যক্তির যন্ত্রণা। এবং, এই প্রতীক্ষার মূল সূত্রটি তাৎপর্য পায় ঐ ব্যক্তির যন্ত্রণার রূপকে আমাদের সকলের যন্ত্রণাকেই মূর্ত করে বলে। যারা এ যন্ত্রণাকে চিনত না, তাদের কাছেই কবিতাগুলি ছিল দুর্বোধ্য। যাঁরা জেনেছিলেন, আজও জানেন, তাঁদের কাছে এরা বহু-আলোক-সম্পাতী। 'কে রবে এ পরবাসে' এ গানটির কাব্যভাষ্য বিষ্ণু দে করেন এই ভাবে,—'পরবাসে রবে কে এ পরবাসে / আজীবন দীর্ঘ পরবাস। / সেদিন দেশের সত্তা রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘশ্বাসে / সুরের সত্যের নিঃসংশয় উদার অক্ষরে / চিরতরে মূর্তি পেল থেকে থেকে একা ভীড়ে / আবৃত্তির বাণী / রবীন্দ্রনাথের গান হয়ে গেল দেশ সারা দেশ / বিস্তৃত যন্ত্রণা নিজবাসভূমি এই পরবাস দেশ।' গীতাঞ্জলি বা তাঁর গানের কবিতার প্রতীক্ষা সর্বদাই প্রায় এই যন্ত্রণাকে স্পর্শ করে থাকে, অথচ একথাও তো শোনা যায় যে, কনিষ্ঠপুত্রের মৃত্যুর অভিঘাতেই এদের একের পর এক উদ্‌গমন। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের কবিতার 'আমি'-চরিত্রটির কথা একটু ভেবে নেওয়া যায়। এও এক আধুনিক 'আমি'—বিংশশতাব্দীর 'আমি'। তিনি রোমান্টিক কবি, কিন্তু শেলী, বায়রন বা কোনো হুগোর মতো তাঁর 'আমি' কদাচ প্রমীথিয়ুসের ভূমিকায় অগ্নিগ্রাহী নয়, নয় জঞ্জাল অপসারণকারী হারকিউলিস। এই ভাঙাচোরা, কিম্ভূতকিমাকার ঔপনিবেশিক পরিবেশে বুঝি তা সম্ভবও ছিল না। যে-অন্ধকারের কথা ঐ 'আমি' বারে বারে বলেছে, সে-অন্ধকার তার অস্তিত্বের অংশ—প্রত্যক্ষ বাস্তব-ভাষ্য হিশাবে, প্রাকৃতিক অর্থে এবং আলংকারিক অর্থে। ভিত্তিভূমিতে এই বাস্তবতা ছিল বলেই সেই 'আমি'র অচরিতার্থতা ও অকৃতার্থতার আর্তি এক জর্জর ব্যক্তিস্বরূপের আত্মস্বরূপের আত্মসচেতনতাপ্রসূত আকৃতি। আকাশে নক্ষত্রের দীপালি

সার্থক হবে 'আমার এই আঁধারটুকু ঘুচলে পরে'। এখানে ঐ ভিত্তিতেই দাঁড়িয়ে গেল এক বিশ্বনাগরিকের চেতনার সুপারস্ট্রাকচার। 'আমার এই আঁধার' ব্যক্তিগত জটিলতার আঁধার, এক ঔপনিবেশিক যন্ত্রণা-জর্জর ব্যক্তি, যিনি বিশ্বের বৃহৎ নগরীর আলোকসজ্জা দেখেছেন, তাঁরও 'আঁধার', আবার সেটা সভ্যতার অন্তহীন প্রয়াস ও ব্যর্থতার মধ্যবর্তী অন্ধকারও বটে। বলাকার সবুজের অভিযান, 'সর্বনেশে' কবিতায় ছায়া ফেলছে ঔপনিবেশিক জীবনের নিঃস্রোত পঙ্করুদ্ধতার বিরুদ্ধে যুবকদের সাগ্নিক প্রয়াসের 'ডানা ঝাপটানি'। 'আমরা চলি সমুখপানে' কবিতাও তা হতে বাধা নেই। কিন্তু ঐ কবিতা যেদিন লিখেছেন তিনি, সেদিনই রাত্রিবেলা লিখেছেন এক 'আঁধার'-চেতনা-সমন্বিত গান—সন্ধ্যা হল গো—ওমা সন্ধ্যা হল, বুকে ধরো। সমস্ত গানটিতে যে ক্লান্তির সুর ধ্বনিত, তা ব্যক্তির নিশ্চয়, সামাজিকেরও বটে।[৫] সব সময়ে যে, এমনভাবে বলা যায় না, তা জানি। 'এরে ভিখারী সাজায়ে কী রঙ্গ তুমি করিলে' এই গানটি যেদিন লেখা, সেদিনই লেখা, 'এবার ঐ এল সর্বনেশে গো।' তবু ভুলতে পারি না দুটোরই প্রধান চিত্রকল্পে রয়েছে এক বিরাট দুর্জ্ঞেয়কে বধূর মতো বরণ করার ইঙ্গিত।

এবং, এই বিশেষ জীবনের অভিঘাতটি একেবারে মিলিয়ে যায় না বলেই, প্রলোভন সত্ত্বেও, বাইবেলের কচিৎ কোনো অংশের সঙ্গে গীতাঞ্জলির কোনো কোনো অংশের ভাবগত আপতিক সাদৃশ্য খুঁজতে ইচ্ছে করে না। 'আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে তিনি যেন ফিরে না যান'—এই ভাব ফুটে উঠেছে 'সে যে পাশে এসে বসে ছিল তবু জাগি নি', 'উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে' এই জাতীয় আরো কবিতায়; 'তিনি আসছেন'—এই বার্তা ব্যক্ত হয়েছে 'তোরা শুনিসনি কি শুনিসনি তার পায়ের ধ্বনি' এই কবিতায়। জানি বাইবেলের সেণ্ট ম্যাথুকথিত গস্‌পেলের সেই বিখ্যাত প্যারাবল, কেউ কেউ ঘুমিয়ে পড়েছিল, বর যখন অর্ধরাত্রে পৌঁছেছিলেন, তার আগেই—And at midnight there was a cry made, Behold the bridegroom cometh; সন্ত ম্যাথুর প্রভু তাই বারবার বলছেন, Watch ye therefore: for ye know not what hour your Lord doth come. জানি, দুর্যোগের অধরাত্রে দ্বার ভেঙে পড়ার মুহূর্তে তাঁর অতর্কিত আবির্ভাব 'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে জানি নাই তো তুমি এলে আমার ঘরে'। জানি, বাইবেলের ডেভিডের Psalms-এর (৫১ সংখ্যক) have mercy upon me...wash me thoroughly from mine iniquity and cleanse me from my sin—এই প্রার্থনাগীতির কথা মনে পড়লেও পড়তে পারে গীতাঞ্জলির 'দয়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে' কবিতাটিতে ডেভিডের Psalmsগুলিতে যে 'শত্রু' বা রিপু বা enemy-চেতনা কখনো কখনো খর হয়েছে, গীতাঞ্জলিতে ৮০ এবং ৮১ সংখ্যক গানের মতো রচনায় 'ওরা'-প্রসঙ্গে তার কথা ভেসে উঠতে পারে[৬]। যদিও তা সবই মিলিয়ে যাবে, দেশ কাল

৫ কবিতাটি এবং গানটির রচনার দিনাঙ্ক ৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ সাল। শুধু গানটির বেলায় স্পষ্ট করে বলা আছে 'রাত্রি'।

৬ ১০২-সংখ্যক Psalms-এ Hide not thy face from me...My heart is smitten and withered like grass...I am like a pelican of the wilderness—ইত্যাদিকে আমি মেলাতে চাইছি না গীতাঞ্জলির 'অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না' কবিতার 'জানি আমার কঠিন হৃদয়' 'দেশ বিদেশে কতই ঘুরি' প্রভৃতি অংশের সঙ্গে। 'ব্যর্থ তৃণ' এবং 'না-ফোটা' ফুলের কথা দুজায়গাতেই থাকলেও চাইব না।

ব্যক্তিপাত্রের স্বতন্ত্র বিন্যাসের জন্যই। ডেভিডের Psalms-এ থাকল sin বা পাপের কথা। রবীন্দ্রনাথের কবিতায়, গানে বারে বারে গ্লানি, মলিনতা এবং অন্ধকারের কথা। ঔপনিবেশিক জীবনের গ্লানিই এসব ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তিকে পীড়িত করেছে। যদি কারো মনে হয় এই সুদূর সম্পর্ক কষ্টকল্পিত, তাহলে কবিজীবন থেকে আমি একটি উদাহরণ উপস্থিত করি। তাঁর সামাজিক সত্তাই যে তাঁর কবিতার চরিত্রকল্পনায় বৈশিষ্ট্য সম্পাদন করে, অন্তত কতকাংশে তার পরিচয় পাই 'কাঙালিনী' কবিতার রবীন্দ্রকৃত ব্যাখ্যায় 'এ তো আমার নিজেরই কথা। যে-সব সমাজে ঐশ্বর্যশালী স্বাধীন জীবনের উৎসব সেখানে সানাই বাজিয়া উঠিয়াছে, সেখানে আনাগোনা কলরবের অন্ত নাই; আমরা বাহির-প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছি মাত্র—সাজ করিয়া আসিয়া যোগ দিতে পারিলাম কই'[৭]। যে-প্রতীক্ষার কথা আমরা রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির গানের কবিতার মূলভাব বলে ব্যাখ্যা করছি সে প্রতীক্ষাও তাৎপর্য পায় এই আমাদেরই ভারতবর্ষীয় বিশশতকীয় জীবনপটে। আমি এতক্ষণ যা বলতে চেষ্টা করছি, তিনি অব্যর্থ ভাষায় সংক্ষেপে সেটা বলে দিলেন :

> মানুষের বৃহৎজীবনকে বিচিত্রভাবে নিজের জীবনে উপলব্ধি করিবার ব্যথিত আকাঙ্ক্ষা, এ যে সেই দেশেই সম্ভব যেখানে সমস্তই বিচ্ছিন্ন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃত্রিম সীমায় আবদ্ধ। আমি আমার সেই ভৃত্যের আঁকা খড়ির গণ্ডীর মধ্যে বসিয়া মনে মনে উদার পৃথিবীর উন্মুক্ত খেলাঘরটিকে যেমন করিয়া কামনা করিয়াছি, যৌবনের দিনেও আমার নিভৃত হৃদয় তেমনি বেদনার সঙ্গে মানুষের বিরাট হৃদয়লোকের দিকে হাত বাড়াইয়াছে। সে যে দুর্লভ, সে যে দুর্গম দূরবর্তী।[৮]

এরই জন্য পথে নামা, এরই জন্য অপেক্ষা। গীতাঞ্জলি এবং অন্যত্রও যেসব গানের কবিতায় প্রতীক্ষাই প্রধান ভাবনা, সেসব কবিতার গঠনেও এক বৈশিষ্ট্য এসেছে। গানের দিক থেকে চার ভাগ, কিন্তু কবিতার দিক থেকে দুই অংশে সম্পূর্ণ, এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লিরিকগুলিতে সনেটের সঙ্গে তুলনীয় সংহতি ও বিস্তৃতি, ছড়িয়ে দেওয়া ও গুটিয়ে নেওয়া, সংবৃতি ও বিবৃতি রূপবস্ত হয়ে উঠেছে। কোনো কোনো কবিতায় বাইরে থেকে ভিতরে আসা; কোনো কোনো কবিতায় ভিতর থেকে বাইরে যাওয়া। 'আর নাইরে বেলা নামল ছায়া ধরণীতে' কবিতাটিতে প্রথমাংশে আত্মকথা, দ্বিতীয়াংশে আত্মমুক্তি। 'শ্রাবণ-ঘন-গহন-মোহে' কবিতাটিতে প্রথমে ভাবের বিস্তার, পরে তাকে সংবৃত করে আনা। 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার' কবিতায় প্রথমে সংবৃতি, পরে বিস্তার। তিনবার 'এ' অন্ত্যমিলগুলি পর পর ব্যবহৃত হয়ে ব্যবধান বা দূরত্ব-কল্পনাকে অসীমে পৌঁছে দিয়েছে।[৯]

---

৭ জীবনস্মৃতি / কড়ি ও কোমল

৮ ঐ / ঐ

৯ আমি মানতে পারি না কবিতাটি সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসুর আর-একটি মন্তব্য, "কবিতাটির প্রথম স্তবকে 'যে' অব্যয়ের পুনরুক্তি প্রীতিকর নয়'। এরকম ক্ষেত্রে 'যে' অব্যয়, বাংলা কথ্য ভাষার নিজস্ব চালে এক অনুযোগের সুরকে আভাষিত করে, তার মাধুর্য বুদ্ধদেব বসুর কান এড়িয়ে যাওয়া উচিত হয়নি। আর একটি কথা, frowning forest বা mazy depth of gloom অনুবাদ হিশাবে 'গহন কোন্ বনের ধারে / গভীর কোন্ অন্ধকারে'-কে প্রতিবিম্বিত করতে পারছে কিনা তর্কের বিষয় —কিন্তু ইংরাজিতে যে ছবি দুটি আমরা পাই তা কি রবীন্দ্রনাথের ছবির জগতের পূর্ব-ইঙ্গিত নয়?

আরো উদাহরণ শুধু সংখ্যাই বাড়াবে। এই কাঠামো যে-সব ক্ষেত্রে রক্ষিত হয়নি, সেখানে কবিতাটি প্রথম উচ্চারণ থেকে শেষ শব্দটি পর্যন্ত হয়ে উঠেছে একটি ভাববৃন্তের চারপাশে একই রঙের কয়েকটি পাপড়ি। প্রসঙ্গত 'ঘুমের ঘন গহন হতে' কবিতাটি আমরা স্মরণ করতে পারি। আবার এই দুই কাঠামো যে-চিত্রকল্প-রীতিকে উৎসাহিত করেছে তাও অনুধাবনীয়। কোনো কোনো কবিতায় প্রধান চিত্রকল্পটি প্রথম চরণে বা প্রথম দু-এক পংক্তির মধ্যেই ফুঠে উঠেছে, বাকি কবিতাটি চিত্রকল্পটির ধারক। এর নিদর্শন বহু—'আজ আলোকের এই ঝর্নাধারায়' দিয়ে শুরু করা যায়, সহজে শেষ হবে না তালিকা। আবার কতকগুলি কবিতায় অন্ত্য-চিত্রকল্পটিই প্রধান, সারা কবিতাটি ছিল এরই বাহক। স্মরণ করতে পারি 'আমার এ আঁখি উৎসুক পাখি ঝড়ের অন্ধকারে।' এখানে সমস্ত কবিতাটিই ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে ঐ চিত্রকল্প। স্মরণ করতে পারি সহসা নবীন উষা আসে হাতে আলোকের ঝারি / দেয় সাড়া ঘন অন্ধকারে।' এবং এমন আরো কত।

এ এক অনিবার্য অনুভূতির জগৎ। এখানে এক অভিনব আধ্যাত্মিক বিপরীত-বিহারের পুলক ধ্বনিত 'অসীম ধন তো আছে তোমার' কবিতায়; বিপরীত অভিসার যা কোথাও প্রশ্রয় পায়নি, ধ্বনিত হল 'আমার মিলন লাগি' ও 'ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার' কবিতায়। এই 'নীরব' এমন এক অন্ত্যর্থক 'নীরবে'র প্রসঙ্গও অবার্য হয়ে উঠল এখানেই। শব্দবিরল বাক্যগুলি সেখানে নীরবতার কোল ঘেঁষে চলে যায়। নীরবতা সেখানে নিশীথিনীর মতো ছায়াশরীরিণী—'নিশায় নীরব দেবালয়' সেখানে প্রায় ব্যক্তিপ্রতীক (৩১), 'নীল আকাশের নীরব কথা' (৩৮) সেখানে সাধারণ ব্যাপার, সেখানে নীরবতাই প্রার্থিত হল কথায় (৫৯)। 'ধুলায় লুটানো নীরব বীণা' অনাহত কী আঘাতে বেজে উঠবে—এই প্রতীক্ষা। এক মহানীরবের উদ্দেশ্যে ধ্বনিত অনুযোগ 'ওগো মৌন না যদি কও না কইলে কথা' মনে রাখি। 'ঢেউয়ের মতো ভাষা-বাঁধন-হারা' রাগিণী যাকে শোনানো হবে, তিনিও নীরব হেসে তা তুলে নেবেন শ্রবণে। এবং কী আশ্চর্য, কবি যখন বলেন 'নীরব যিনি তাহার পায়ে নীরব বীণা দিব ধরি', তখন দুই 'নীরব'-এর দুই প্রকারের অসীম ব্যঞ্জনা আমাদেরও টেনে নিয়ে যায় সেখানে, 'সেই অতলের সভামাঝে'। আর সবই, সব কথাই, যেন বিরলে কথনের উপযুক্ত কথ্যস্রোতে প্রাণবন্ত, হ্রস্ব অথচ উচ্ছ্রিত বাক্য। কিন্তু শুধু গেয় সুরেই নয়, কথাতেও সে-অতলকে মূর্ত করতে পেরেছেন বলেই সেগুলি কবিতা। এমন কবিতার কথা আমাদের মনে আছে যেখানে কোনো প্রসাধিত বাক্যই নেই, নেই কোনো সচেতন চিত্রকল্প, কিন্তু যা বিশুদ্ধ আবেগের মূর্তি হতে পেরেছে কেবল পরিমিতির জন্য। হয়তো এমন কবিতার উদাহরণ 'অনেক কথা বলেছিলাম কবে তোমার কানে কানে'। উল্টো উদাহরণও আছে, যেখানে বুঝি পরিসরের স্বল্পতার জন্য জটিল চিত্রকল্প কবিতাটিকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে, স্মরণ করতে পারি—'আমার নয়ন তব নয়নের নিবিড় ছায়ায় মনের কথার কুসুমকোরক খোঁজে'। গানের দিক থেকে চিত্রকল্পের ঋদ্ধ সমাবেশ আমাদের মনোযোগকে খণ্ডিত করে ফেলার আয়োজন ঘটালে সেটাও হয়ে ওঠে সমালোচনার যোগ্য। 'আরো কিছুখন না হয় বসিয়ো পাশে' কবিতাটির প্রথমাংশে—গানের দিক থেকে প্রথম দুই ভাগেই, দুটো রূপান্তরণী চিত্রকল্পের ব্যবহার ঘটেছে—(১) 'শরৎ আকাশ হেরো ম্লান হয়ে আসে / বাষ্প আভাসে দিগন্ত ছলোছলো' এবং (২) 'সে মোর অগম অন্তর পারাবারে/রক্তকমল তরঙ্গে টলোমলো'। তৃতীয়টি

এসেছে আবার শেষকালে, 'সে বাণী আপন গোপন প্রদীপ জ্বেলে / রক্ত আগুনে প্রাণে মোর জ্বলো জ্বলো'। তিনটি চিত্রকল্পের প্রথমটি প্রাকৃতিক পরিবেশের ছলে আত্মকথা হলেও ছবিটা প্রকৃতির। দ্বিতীয়টি প্রেমের, যে প্রেমের স্বরূপব্যাখ্যা হিসাবে ঐ চিত্রকল্পের উদয়। তৃতীয়টি সব শেষে এসেছে অনুক্ত বাণীর উপমারূপে। এর আলোচনার উপযুক্ত ক্ষেত্রে কাব্যের আসর। সেখানে কিন্তু দেখতে দেখতে কবিতাটি শরীর পায়। প্রথম চিত্রকল্পটি গাঢ় করে তোলে সন্ধ্যার ঘনিয়ে আসা ছায়া। 'রক্তকমল' পারাবারের সংযোগে সন্ধ্যার রক্তিম আলো ছড়ায়। শেষ চিত্রকল্পটি সন্ধ্যাকে গাঢ় করে, অন্ধকার জমিয়ে, জ্বালিয়ে দিল প্রদীপ। সেই প্রদীপটিই কবিতার শেষ কথা।

গানের কবিতার বিশিষ্ট কুহক উপলব্ধির উপযুক্ত উপাদান খুঁজে পাই সেই সব কবিতায় অনুভূতি যেখানে শব্দ-সংযোগের রহস্যেই আনন্দের উৎস। 'খোলো খোলো দ্বার রাখিয়ো না আর' গান-কবিতাটি কবিতা হিশাবেও পাঠ্য। কবিতা হিশাবে প্রথমাংশের দীর্ঘ স্বর-সমাবেশ আকুল আহ্বানেরই ধ্বনি-প্রতীক। দ্বিতীয়াংশে সে স্বরধ্বনি অনেকটা সংবৃত। প্রতীক্ষা সেখানে প্রায় প্রাপ্তির কাছাকাছি। এবং সমগ্র গান-কবিতাটিকে ধরে রেখেছে, উজ্জ্বল করে তুলেছে, অর্থকে গূঢ়তা ও ব্যাপ্তি দিয়েছে একই সঙ্গে, এই কেন্দ্রীয় চিত্রকল্প—'আলোকের খেয়া হয়ে গেল দেয়া অস্তসাগর পারায়ে'। এই কুহক অকাট্য হয়ে ওঠে 'বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা'র মতো রচনায়। পেয়ালার রূপক নয়—যেমন পেয়েছি 'আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া' কবিতায়। পেয়ালাটাই এখানে বিষয়। সে এখানে রূপকের প্রসাধিত পরিসরকে না-ছুঁয়ে একেবারে বাস্তবের পেয়ালাই থেকে গেছে। থেকে গিয়েও অসামান্য হয়েছে সে শেষের আকিঞ্চনে—'এ রসে মিশাক তব নিঃশ্বাস / নবীন উষার পুষ্প-সুবাস।—এরই 'পরে তব আঁখির আভাস দিয়ো হে দিয়ো'। 'আঁখির আভাস' অর্থস্তর সৃজনে আধুনিক কবিতা। এমনি কবিতা 'কী ফুল ঝরিল বিপুল অন্ধকারে'। একটা নাতিস্ফুট বেদনা এই কবিতায় বুঝি দেহ পেয়েছে সব শেষে প্রথম চিত্রেই। 'এসে ফিরে গেল বিরহের ধারে ধারে' যেন ভাষারও ভাষাতীতের দ্বারে এসে করাঘাত। এমনি, 'আমি যখন তাঁর দুয়ারে ভিক্ষা নিতে যাই' কবিতার শেষ ভাগ। এমনই স্মরণীয় 'চাঁদ জোয়ার' 'সেতু : নৌকা পারাপার' কি, 'ছিন্ন বীণা বা গানের আসরের চিত্রকল্প, 'আলো অন্ধকারের' 'চিত্রকল্প খেলা-খেলাভাঙার ছবি। এবং শুধু আলোর পিপাসা নয়, এক অনন্তভাষী অন্ধকারের পিপাসাও ছিল তাঁর আধুনিকের মতোই। আলোও যে একটা আড়াল, একথাও তিনিই প্রথম বলেছেন—'আঁখি হতে অস্তরবির আলোর আড়াল তোলো'।

কাব্যশৈলী ও অনুবাদ প্রসঙ্গ

পৃথ্বীন্দ্র চক্রবর্তী

সকলেই জানেন, কবিতা-অনুবাদ একরকম অসম্ভব। মূল ভাষার ছন্দ ও স্পন্দবিন্যাস অনুবাদে রক্ষা করতে গেলে প্রায়শই কৃত্রিমতার আশ্রয় নিতে হয়। প্রতিভাবান কবিরা এ-জাতীয় পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন—যেমন সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মন্দাক্রান্তা-ছন্দে রচিত যক্ষের নিবেদন কবিতাটি। কিন্তু মূল ভাষার শৈলীকে অনুবাদে অটুট রাখা ভাবাই যায় না। এই প্রসঙ্গে ছন্দশাস্ত্র আর শৈলীশাস্ত্র[১]র পার্থক্যটি বুঝতে হবে। ছন্দ প্রধানত কানের ব্যাপার, আর শৈলী প্রধানত মননের ব্যাপার। কোনোটিকেই বাগর্থের পরিধির মধ্যে আনা ঠিক হবে না। ভাষাবাক্যের স্পন্দবিন্যাস ও ধ্বনিতরঙ্গের সুমিত যতিভঙ্গের উপর হলো ছন্দের ভিত্তি; অনুপ্রাস স্তবকগঠনসজ্জা ইত্যাদিও এর আওতায় পড়ে। কিন্তু ভাষাবাক্য রচনাকালে রচয়িতার মনে একঝাঁক বিকল্প শব্দ, বাগ্‌বিধি এবং অন্যান্য উপাদান এসে হাজির হয়। বাক্যের গঠনপ্রক্রিয়ার দিকে দৃষ্টি দিলে এটা সহজেই প্রতীয়মান হবে যে একটি শব্দের উচ্চারণ শেষ হলে তবেই অন্য একটি শব্দ-উচ্চারণ সম্ভব হয়, এবং উচ্চারণকালে একই সঙ্গে দুটি শব্দ বাক্‌যন্ত্রের দ্বারা কোনোপ্রকারেই পরিস্ফুট করা যায় না। অনেকগুলি বিকল্পশব্দের মধ্যে মাত্র একটিকে বেছে নিতে হয়। এটি একটি স্বতঃসিদ্ধ। অর্থপরিস্ফুটনার তাগিদ, রচয়িতার বিশেষ মননভঙ্গী এবং ভাষাব্যবহারের অভিজ্ঞতাজাত বিশেষ অভ্যাসধারার জন্যে এই বিকল্পশব্দাবলীর সংখ্যা খুব বেশি হতে পারে না। বাক্যের প্রথম দিকে একটু বেশি হলেও, বাক্যের শেষের দিকে বিকল্পের সংখ্যা কমে আসে। অর্থের দিক দিয়ে দেখলে এই বিকল্পগুলিকে প্রতিশব্দ বলা যায়। পদ্যবাক্যরচনায় বিকল্প-শব্দচয়নের স্বাধীনতা কম, কেননা ছন্দের তাগিদে একটি বিশেষ পরিসরের বা মাত্রার বিকল্প শব্দই চয়িত হয়। যদি এমন একটি বিশেষ শব্দ কবি বেছে নেন যা বাক্যের নির্দিষ্ট পরিসরে ঠিক মানানসই হচ্ছে না, অথচ শব্দটি অবর্জনীয়, তাহলে কবি সেই বিশেষ শব্দটি রেখে তার আগের বা পরের অংশগুলিকে পরিবর্তন করে ছন্দের মূল কাঠামোটিকে বজায় রাখেন। ছন্দ-রূপদক্ষ কবির বিকল্প শব্দ চয়নে মূল লক্ষ্য থাকে যাতে সমগ্র ধ্বনিতরঙ্গের সুমিত যতিভঙ্গের ধর্মটি নষ্ট না হয়। কিন্তু সৃজনশীল রচনায়, বিশেষ করে পদ্যরচনায়, ছন্দের এই সুমিত যতিভঙ্গের কাঠামোর কঠোর সীমাবদ্ধতা বজায় রেখেও ধ্বনিভিত্তিক ও মননভিত্তিক অন্যান্য উপাদানের নিপুণ প্রয়োগে রচয়িতা কিছু বাড়তি সৌকর্য এনে থাকেন। এই উপাদানগুলিকে ঠিক ছন্দের আওতায় আনা ঠিক হবে না। কেননা এই উপাদানগুলি ধ্বনিতরঙ্গের সুমিত যতিভঙ্গের সুসমঞ্জস সৌন্দর্যবর্ধনে কোনো সাহায্য করে না, বরং অন্য এক ধরনের সৌন্দর্যবোধ এনে দেয়—বা বলা যায়, সৌন্দর্যের একটি দ্বিতীয় ডাইমেনশন বা মাত্রা সৃষ্টি করে। সৌন্দর্যের এই মাত্রাটিকে শুধু ছন্দের ধ্বনিভিত্তিক পরিমিতিবোধের দ্বারা সম্যক বোঝা যাবে না। বাক্যের সঙ্গে অন্য বাক্যের সম্পর্কজাত চেহারা, অর্থাৎ রচনার সমগ্র মূর্তির পরিপ্রেক্ষিতেই এই ধ্বনি-অতিরিক্ত অন্তঃকলাগুলিকে বোঝা যাবে। বাক্যপরিসরভুক্ত নানা যতিভেদ, ছন্দস্পন্দের বিন্যাসভেদ, অনুপ্রাসের প্রকারভেদ, ছত্রের আকারভেদ, স্তবকের সজ্জাভেদ, এমনকি স্তবকাতিরিক্ত

সমগ্র কবিতাধৃত অন্যান্য ছন্দ-তাৎপর্যাবলী ধরলেও—বাক্যাংশের বা ছত্রাংশের পারস্পরিক অন্বয়মূলক সম্পর্কে নতুন মূল্যারোপ, এমন কি অন্বয় সৃজনকৌশলের মুনশীআনা, বাক্‌প্রতিমার প্রয়োগভেদ, এমনকি আপাত তুচ্ছ শব্দাবলীর সামান্য অদলবদলে, সমগ্র বাক্যে বা বাক্যাংশে নতুন দ্যোতনা বা লক্ষণাপ্রদান, পুনর্বৃত্তিকলার বিচিত্র ব্যবহারভেদ ইত্যাদি দেখিয়ে কী করে সৃজনশীল রচনায় রচয়িতা সৌন্দর্যের এই দ্বিতীয় মাত্রাটি সৃষ্টি করেন—ছন্দঃশাস্ত্র এই জিজ্ঞাসার ঠিক সমাধান করতে পারে না। ছন্দ-অতিরিক্ত প্রধানত মননজাত এই সব অন্তঃকলাই শৈলীশাস্ত্রের মুখ্য আলোচ্য বস্তু।

পাপুয়া নিউগিনির মুখবাহিত সাহিত্য-ঐতিহ্য থেকে উদাহরণযোগে কাব্যশৈলীকলার বৈশিষ্ট্য-গুলি দেখানো যেতে পারে। দক্ষিণ পাপুয়ার 'মেকিও'[২]-দের মধ্যে সুপরিচিত এই ইভিবাহিত কবিতাটি লক্ষ্য করা যাক :

(১) আমু　মাইনা　লা　মাইনা
আমু　তাইনা　লা　তাইনা
মিআ　মাইনা　লা　মাইনা
মিআ　তাইনা　লা　তাইনা ॥

মূল ভাষা যে না জানবে, তার পক্ষেও উপরের শব্দসমষ্টি বা ধ্বনিতরঙ্গকে পদ্যবদ্ধ বলে স্বীকার করতে অসুবিধে হবে না। এমন কি এই শব্দগুলিকে উপরের মতো না সাজিয়ে যদি একটানা গদ্যের মতো লিখে সাজিয়ে দিই, তাহলেও যেকোনো শ্রোতা 'মাইনা তাইনা-র অনুপ্রাস লক্ষ্য করে ঐ ঐ শব্দ কানে লাগা মাত্রই সতর্ক হবেন। এবং সমগ্র রচনাটি শুনবার পর নিশ্চিত ধারণা হবে যে 'আমু মাইনা' 'লা মাইনা' ইত্যাদি অংশগুলির প্রত্যেকটি সমগ্র রচনার গুরুত্বপূর্ণ বা স্মরণযোগ্য অংশ। যাঁদের চিন্তাধারা বিজ্ঞানপরিশীলিত, তাঁরা এই স্মরণযোগ্য অংশকে বলবেন য়ুনিট বা একক। পদ্যবদ্ধ বা ছন্দ সম্বন্ধে যাঁদের প্রাথমিক জ্ঞান আছে. তাঁরা এই অংশকে 'পর্ব' বলে সহজেই শনাক্ত করবেন। গদ্যের মতো করে লেখা থাকলেও ছান্দসিক মাত্রই সমগ্র রচনাটি শুনে পর পর দুটি পর্ব মিলে যে ছত্রবন্ধ সৃষ্টি হচ্ছে তা চিনে নেবেন, কেননা 'আমু মাইনা / লা মাইনা' শোনার পর যখন তিনি আবার 'আমু…' ইত্যাদি শুনবেন তখন তিনি এই দ্বিতীয় ধরনের অনুপ্রাসে সতর্ক হবেন এবং এটাকে একটা বৃহত্তর য়ুনিটের সূচনা হিসেবে মেনে নিয়ে 'আমু…' ইত্যাদি দুইপর্বযুক্ত রচনাংশটিকে ছত্র বলে চিনে নেবেন। ঠিক এই ভাবেই 'মিআ মাইনা / লা মাইনা এবং 'মিআ তাইনা / লা তাইনা' তাঁর কাছে দুটি ছত্র বলে ধরা পড়বে। এবং খুব সম্ভব, ছান্দসিক, আমি উপরে যেভাবে সাজিয়ে দিয়েছি ঐভাবে, সমগ্র রচনাটিকে চার ছত্রে এবং দুই প্রস্থে বা স্তবকে উপস্থাপিত করবেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, শুধুমাত্র কানের পরিশীলন দিয়েই, ক্রম-উচ্চারিত ধ্বনিসমষ্টির স্পন্দবিন্যাস ও যতিপাতনজনিত তরঙ্গভঙ্গ ছান্দসিক সহজেই চিনে নেন। এবং কোন্‌টি পর্ব, কোন্‌টি ছত্র, কোন্‌টি স্তবক, ইত্যাদি সম্পর্কেও তিনি নিশ্চিত হতে পারেন।

মনে রাখতে হবে যে, যে-রচনাটি উপরে উল্লেখ করেছি, সেটি হলো একটি মুখবাহিত[৩] কবিতা, যা আগে কেউ লিখে রাখেননি। যে-সংস্কৃতিতে লিপিব্যবহার নেই, সেই সংস্কৃতিতে লোকের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, সত্য সম্পর্কে ধারণা, গালগল্প, কিংবদন্তী ইত্যাদি সবই মুখে মুখে প্রচলিত ও প্রবাহিত

হয়ে থাকে। উদ্ধৃত কবিতাটি 'অতিকথা'[৪]-জাতীয় একটি আখ্যানের অংশ। গ্রামের জ্ঞানবৃদ্ধরা এই জাতীয় রচনাকে পবিত্র ও চিরসত্য বলে মনে করেন। কাজেই এই জাতীয় কবিতা যখন তাঁরা আবৃত্তি বা সম্প্রচার করেন, তখন তাঁরা এর মূল কাঠামো বা চিরায়ত রূপটিকে নিখুঁত ভাবে বজায় রাখতে চেষ্টা করেন। কিন্তু কী ভাবে করবেন? যদি না স্মৃতিতে ধরে রাখবার মতো কোনো বিশেষ বিধিপদ্ধতি এই সংস্কৃতিতে না থাকে? বৈদিক পদপাঠ, ক্রমপাঠ, জটাপাঠ ইত্যাদি পাঠপদ্ধতিগুলি হলো এক ধরনের স্মরণকলা[৫]। এই জাতীয় জটিল উন্নত পাঠপদ্ধতি বা বিধিপদ্ধতি না থাকুক, সমস্ত সংস্কৃতিতে ইতিশ্রুত[৬] বা ইতিবাহিত[৭] সাহিত্যে বিশেষ করে পদ্যবন্ধে ছন্দ-অতিরিক্ত এক জাতের কাব্যিক অন্তঃকলা[৮] থাকে। কোনো কোনো ঐতিহ্যে এর ব্যবহার ও বৈচিত্র্য বেশি, কোনো কোনো ঐতিহ্যে বা কম।

এই অন্তঃকলাগুলি শুধুমাত্র ধ্বনির জ্ঞান বা ছন্দের কান দিয়ে বোঝা যাবে না। ভাষার ধ্বনিভূমি ছাড়া যে অন্য এক ভূমি আছে, যাকে দ্যোতনা বা অর্থের ভূমি বলা যেতে পারে, তার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে এই অন্তঃকলাগুলিকে সম্যক উপলব্ধি করতে হলে। মেকিওরা উপরের কবিতাটি শোনামাত্রই তার ছন্দটি বুঝবে, অর্থটিও বুঝবে, এবং সাধারণ অর্থ ছাড়া যদি অন্য কোনো ইঙ্গিত, বা সঙ্কেত থাকে তাও হয়তো বুঝবে। কাজেই উপরের কবিতাটির একটী সাদামাটা অর্থ করা যাক :

(২) আমু মাইনা লা[৯] মাইনা
(=বসি আসি আসি)

আমু তাইনা লা তাইনা
(=বসি অপেক্ষা করি অপেক্ষা করি)

মিআ মাইনা লা মাইনা
(=বাঁচি আসি আসি)

মিআ তাইনা লা তাইনা
(=বাঁচি অপেক্ষা করি অপেক্ষা করি)

মূল কবিতাটিতে আসা যাক। ছন্দের দিক দিয়ে প্রতিটি ছত্রকে 'আমু মাইনা / লা মাইনা' এইভাবে পর্বভাগে ভেঙে পড়লেও, মেকিওরা যখন এই কবিতাটি বলবে বা শুনবে তখন তারা ছত্রগুলিকে হৃদয়ঙ্গম করবে কিন্তু 'আমু / মাইনা লা মাইনা' এই ভাবে ভেঙে। আসলে চারটি ছত্রই এইভাবে ভাঙা যাবে :

(৩) আমু / মাইনা লা মাইনা
আমু / তাইনা লা তাইনা।
মিআ / মাইনা লা মাইনা
মিআ / তাইনা লা তাইনা॥

তাহলে দ্যোতনার দিক দিয়ে দেখলে আমরা পাবো এই চারটি মাত্র অংশ : ১ 'আমু', ২ 'মাইনা লা

মাইনা', ৩ তাইনা লা তাইনা', ৪ 'মিআ'। দ্যোতনাবোধক সংখ্যাচিহ্ন দিয়ে কবিতাটিকে এই ভাবে উপস্থাপিত করা যায় :

(৪) ১ ২
১ ৩
৪ ২
৪ ৩

লক্ষ্য করবো প্রতিটি অংশ দুবার করে পুনর্বৃত্ত বা পুনরুক্ত হয়েছে। তাই মূলে চারটি মাত্র অংশ থাকলেও, সমগ্র কবিতাটিতে গুনতিতে পাচ্ছি আটটি অংশ। এই কবিতাটির গড়নে পুনর্বৃত্তি-কলাটি[১০] ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে। কিন্তু পুনর্বৃত্তির ধরন সব অংশের এক নয়। ১-সংখ্যক অংশটি মাত্র প্রথম স্তবকেই ব্যবহৃত হয়েছে। এবং দুক্ষেত্রেই ছত্রের আদিতে। ৪-সংখ্যক অংশটি মাত্র দ্বিতীয় স্তবকে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানেও আবার দুক্ষেত্রেই ছত্রের আদিতে। ২-সংখ্যক অংশটি স্তবক-অভ্যন্তরে পুনর্বৃত্ত হয়নি। ৩-সংখ্যক অংশটির বেলায়ও তাই হয়েছে। এরা বরং স্তবকান্তরে পুনর্বৃত্ত হয়েছে : ২-সংখ্যক বসেছে প্রতিটি স্তবকের প্রথম ছত্রের অন্তে, ৩-সংখ্যক বসেছে প্রতিটি স্তবকের দ্বিতীয় ছত্রের অন্তে। উপরের বিশ্লেষণবিবৃতিগুলিকে সংক্ষেপে এইভাবেও বলা যায় : ১-ও ৪-সংখ্যক অংশ দুটি ছত্রাদিক ও স্তবকাভ্যন্তরিক, আর ২-ও ৩-সংখ্যক অংশ দুটি ছত্রান্তিক ও স্তবকান্তরিক।

উপরের সংখ্যাচিহ্নে রূপান্তরের চেহারাটি দেখলে কিন্তু একটি গলদ চোখে পড়বে। সেটি হলো, ২- আর ৩-সংখ্যক অংশ দুটি যে অনুপ্রাসসূত্রে আবদ্ধ সেটি দেখানো হয় নি। ১- আর ৪-সংখ্যক অংশ দুটির মধ্যে কিন্তু এই মিলটি নেই। তাহলে অনুপ্রাসের গুণটিকে দেখিয়ে সংখ্যাচিহ্নে রূপান্তরিত কবিতাটিকে এই ভাবে লেখা চলে :

(৫) ১ ২-ক
১ ৩-ক
৪ ২-ক
৪ ৩-ক

এই পুনর্লিখিত সংখ্যাচিহ্নরূপান্তরটির দিকে দৃষ্টি দিলে দেখবো যে সমগ্র কবিতাটি একটিমাত্র অন্ত্যানুপ্রাস দিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আছে, আর স্তবক দুটির পার্থক্য ধরা পড়ছে আদ্যানুপ্রাসের অভাব দিয়ে। (স্তবক-অভ্যন্তরে ছত্রের আদ্যংশের পুনর্বৃত্তিকে আদ্যনুপ্রাস না বলাই ভালো। আদ্যনুপ্রাস ও ছত্রের আদ্যংশের পুনর্বৃত্তি আমাদের দেশের প্রাচীন তামিল কবিতায় আছে।)

মূল কবিতাটি যদি ভালো করে লক্ষ্য করি, তাহলে দেখবো—পুনর্বৃত্তিকে একটি কৌশল হিসেবে ছত্রাংশের অভ্যন্তরেও ব্যবহার করা হয়েছে। ২-সংখ্যক অংশে 'মাইনা' শব্দটি, ৩-সংখ্যক অংশে 'তাইনা' শব্দটি দুবার করে পুনর্বৃত্ত হয়েছে—এবং দুক্ষেত্রেই পুনর্বৃত্ত শব্দদুটির মাঝখানে 'লা' শব্দটি নাক উঁচিয়ে আছে। শব্দকে ভিত্তি করে পুনর্বৃত্তিকৌশলটি কী করে এই কবিতায় কাজ করছে তা এবার দেখবো : ১ 'আমু', ২ 'মাইনা', ৩ 'লা', ৪ 'তাইনা', ৫ 'মিআ'—সবশুদ্ধ এই পাঁচটি শব্দের

প্রথম ও পঞ্চমটি দুবার, আর দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থটি চারবার করে পুনর্বৃত্ত হয়েছে। এবং এখানে পুনর্বৃত্তির ধরনটা একটু স্বতন্ত্র :

(৬) ১ম ২য়-ক ৩য় ২য়-ক
১ম ৪র্থ-ক ৩য় ৪র্থ-ক
৫ম ২য়-ক ৩য় ২য়-ক
৫ম ৪র্থ-ক ৩য় ৪র্থ-ক

(৫)-এর ছকে ছত্রাংশভিত্তিক পুনর্বৃত্তির ধরনটা ছিলো লম্বমান[১১]। (৬)-এর ছকের ধরনে লক্ষ্য করা যাবে—শব্দভিত্তিক পুনর্বৃত্তি লম্বমানও বটে, আবার দিক্‌শায়ীও[১২] বটে। লম্বমান রেখায়—অর্থাৎ উপর থেকে নিচে—১ম শব্দটি ও ৫ম শব্দটি স্তবকাভ্যন্তরে সরাসরি পুনর্বৃত্ত হয়েছে কিন্তু ২য় ও ৪র্থ শব্দদুটি সমগ্র কবিতায় পর্যাবৃত্ত[১৩] হয়েছে। এছাড়া ৩য় শব্দটি আর-ক অনুপ্রাসটি সবকটি ছত্রেই পুনর্বৃত্ত হয়েছে, যথাক্রমে একবার ও দুবার করে।

(৭) ১ম ↓ ১ম ৫ম ↓ ৫ম
২য়-ক ↓ ৪র্থ-ক ↓ ২য়-ক ↓ ৪র্থ-ক
৩য় ↓ ৩য় ↓ ৩য় ↓ ৩য়
২য়-ক ↓ ৪র্থ-ক ↓ ২য়-ক ↓ ৪র্থ-ক

দিকশায়ী রেখায় পুনর্বৃত্তির ধরনটা কিন্তু আলাদা। অর্থাৎ বাম থেকে ডানদিক দিয়ে ছত্ররেখা ধরে দেখলে লক্ষ্য করবো যে ১ম ও ৫ম শব্দদুটি মোটেই পুনর্বৃত্ত হয়নি, আবার ২য় আর ৪র্থ শব্দদুটি নিজের নিজের ছত্রে দুবার করে পুনর্বৃত্ত হয়েছে ৩য় শব্দকে টপকে—অনেকটা অশ্বগতির ঢঙে। পুনর্বৃত্তির এই ধরনটিকে অশ্বাবৃত্তি[১৪] বলা যেতে পারে :

(৮) ১ম ২য়-ক ৩য় ২য়-ক
১ম ৪র্থ-ক ৩য় ৪র্থ-ক
৫ম ২য়-ক ৩য় ২য়-ক
৫ম ৪র্থ-ক ৪য় ৪র্থ-ক

(৫)-এর ছকে পুনর্বৃত্তিকলার ছত্রশায়ী এই স্বরূপটি ধরা পড়েনি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, পুনর্বৃত্তিকলার বিচিত্র প্রয়োগে দিকশায়িরেখাধৃত ও লম্বমানরেখাধৃত সম্পর্কগুলির ঘাত-প্রতিঘাতে মুখে মুখে রচিত এই ছোট্ট কবিতাটি একটি সুঠাম সৌকর্য লাভ করেছে। এই সৌকর্য শুধুমাত্র কাব্যছত্রে সুমিত যতিপাতনজনিত ধ্বনিতরঙ্গভঙ্গ দ্বারা সম্ভব হয়নি—ছন্দ-অতিরিক্ত, অন্তত আলোচ্য কবিতাটির ক্ষেত্রে, পুনর্বৃত্তিকলার জটিল প্রয়োগেই কাব্যসৌন্দর্যের দ্বিতীয় মাত্রাটিকে উপলব্ধি করা যাচ্ছে।

মূল কবিতাটি সম্পর্কে এই পর্যন্তই যথেষ্ট। এইবার দেখবো অনুবাদে কী ভাবে এই সব কাব্যশৈলীকলা[১৫] রক্ষা করা যাবে। সকলেই বলবেন— (২)-এর ছকে যে বাংলা আক্ষরিক প্রতিশব্দগুলি বসিয়েছি—সেগুলিকে ঐ ভাবে সাজালে যা দাঁড়ায়—তাকে পদ্য বা গদ্য কিছুই বলা যাবে না। এখানে বিকল্প প্রতিশব্দাবলীর সুযোগ নিতে হবে, দরকার হলে বাক্‌রীতিও পাল্টাতে হবে :

(৯) বসলাম এলাম এলাম।
বসলাম দাঁড়াই দাঁড়াই ॥
বাঁচলাম এলাম এলাম।
বাঁচলাম দাঁড়াই দাঁড়াই ॥

এও কেউ মেনে নেবে না। কালবাচক তফাৎটাকে ('আম' / 'আই' ক্রিয়াবিভক্তি) বাদ দিলেও, বসার পাশে দাঁড়াই শব্দ বসালে দাঁড়ানোর বাগ্‌বিধিগত অর্থটা খোয়া যায়, বরং এক্ষেত্রে পাঠকের উঠবস করার কথাটাই হয়তো মনে আসবে। শব্দের অনেক হেরফের করে, অন্য প্রতিশব্দের সুযোগ নিয়ে যদিবা অনুপ্রাস—পূর্ণত বা অংশত—রক্ষা করা যায়, মূল কবিতার পুনর্বৃত্তিকলার জটিল সজ্জাকে বাংলা রূপান্তরে আনা অসম্ভব মনে হয়েছে আমার।

(১০) এলাম বসলাম এলাম।
এলাম থাকলাম বসলাম ॥
এলাম বসলাম এলাম
এলাম বাঁচলাম বসলাম ॥

এও কেউ মেনে নেবে বলে মনে করি না। যদিও এই রূপান্তরে অনুপ্রাস ও পুনর্বৃত্তিকলার আংশিক গুণগুলিকে রক্ষা করা হয়েছে। এখানে অনুপ্রাসের অতিরিক্ত ব্যবহার বা একঘেয়েমির কথা বাদ দিলেও—সবটা মিলে কোনো ভাববস্তু ফুটে উঠছে না, কবিত্ব বা পদ্যত্বরও কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তাই আমি এই সমস্যার সমাধান করতে চাই অন্যভাবে :

(১১) এলাম বসলাম অপেক্ষায়
অপেক্ষায় থাকা অপেক্ষায়।
এলাম বসলাম নিলাম ডেরা
অপেক্ষায় তাও অপেক্ষায় ॥

এই বাংলারূপান্তরটির দোষগুণ বিচারের আগে, মূল কবিতাটি যিনি সংগ্রহ করেছেন, তাঁর[১৬] কৃত ইংরেজি রূপান্তরটি দেখা যাক :

(১২) I come. I come and sit.
I wait. I wait and sit.
I come. I come and live.
I wait. I wait and live.

মূল কবিতার ছত্র ছিলো দ্বিপর্বিক : আমু মাইনা / লা মাইনা। ইংরেজি অনুবাদে ছত্র হয়েছে ত্রিপর্বিক—আয়াম্বিক ছন্দে। ছত্রান্তিক মিল অনুবাদে ত্যক্ত হয়েছে—তার জায়গা নিয়েছে অন্ত্যপর্বের

পুনর্বৃত্তি। আসলে পুনর্বৃত্তিকলাকেই অনুবাদে ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। আমাদের (৬)-এর ছকটিকে একটু সরলীকৃত করে নিয়ে তার সঙ্গে এই ইংরেজি অনুবাদের পুনর্বৃত্তিকলাসজ্জা তুলনা করে দেখবো এবার :

(১৩) আস্থু[১] মাইনা[২] লা মাইন[২]
(I) sit/ (I) come/ (I) come

আস্থু[১] তাইনা[৩] লা তাইনা[৩]
(I) sit/ (I) wait/ (I) wait

মিআ[৪] মাইনা[২] লা মাইনা[২]
(I) live/ (I) come/ (I) come

মিআ[৪] তাইনা[৩] লা তাইনা[৩]
(I) live/ (I) wait/ (I) wait

মূলের ছন্দোগত প্রথম ছত্রার্ধকে ভেঙে অনুবাদে দুটি পর্বে রূপান্তরিত করা হয়েছে, দ্বিতীয় ছত্রার্ধ অনুবাদে পুরো একটি পর্বের সম্মান পেয়েছে। এই পরিবর্তনে অনুবাদক ভিত্তি হিসেবে নিয়েছেন মূলের অর্থদ্যোতক য়ুনিটগুলিকে, ছন্দোভাগকে নয়। মূল রচনাটির সজ্জা ছিলো

(১৪) ১ ২ ২
১ ৩ ৩
৪ ২ ২
৪ ৩ ৩

মূলের অর্থদ্যোতনাময় পুনর্বৃত্তিকলাকে ভিত্তি করার জন্য অনূদিত রচনাটির অবয়বে পুনর্বৃত্তির রেখাশায়ী ও লম্বমান স্বভাব দুটি পরিস্ফুট হতে পেরেছে। কিন্তু অনুবাদটিতে য়ুনিটগুলিকে প্রতিছত্রে বিপরীতমুখী করে দেওয়া হয়েছে :

(১৫) ২ ২ ১
৩ ৩ ১
২ ২ ৪
৩ ৩ ৪

এর ফলে যে ছোটখাটো পরিবর্তনগুলি ঘটেছে, তার খুঁটিনাটিতে যাবো না। শুধু এটুকু উল্লেখ করবো যে আয়াম্বিক পর্বের আদ্যংশ নির্বল বা অপ্রস্বরিত হলেও অন্তত 'and' অংশটি লম্বমান পুনর্বৃত্তির ফলে যে-স্তম্ভটির সৃষ্টি হয়েছে, তা মূল কবিতার 'লা' (অন্ত্যপর্বের আদ্যংশ)-সৃষ্ট স্তম্ভের সমান মর্যাদা পেয়েছে। মোটামুটি ইংরেজি অনুবাদের মূলের ভাববস্তু ও অবয়ব—দুইই রক্ষিত হয়েছে।

এবার দেখবো আমার প্রস্তাবিত অনুবাদটিতে (১১-এর ছক) কী ধরনের পরিবর্তন স্থান পেয়েছে। ছন্দের দিক দিয়ে আমি সাত-মাত্রার চালে অনুবাদটিকে উপস্থাপিত করেছি। মিলের দিকে দৃষ্টি দিইনি। আমিও পুনর্বৃত্তিকলাকে ভিত্তি করে নিয়েছি। প্রস্তাবিত বাংলা রূপান্তরের

দিকে ভালো করে দৃষ্টি দিলে এই কয়টি পরিবর্তন ও বৈশিষ্ট্য সকলেরই গোচরীভূত হবে :

১ ॥ ছন্দের দিক দিয়ে মূলের ছত্র দ্বিপর্বিক, ইংরেজির ছত্র দ্বিপর্বিক—কিন্তু পর্বদুটি অসমান—প্রথমটি সাত-মাত্রার, দ্বিতীয়টি পাঁচ-মাত্রার।

২ ॥ প্রতি স্তবকের দ্বিতীয় ছত্রের একটি য়ুনিটকে প্রথম ছত্রে নিয়ে আসা হয়েছে, যেমন 'তাইনা' (I wait, এখানে 'অপেক্ষায়')।

৩ ॥ অন্তঃকলা বা পুনর্বৃত্তিকলাগত ভাগের দিক দিয়ে মূলের ছত্র ত্রিভাগিক (১৪)-এর ছক), ইংরেজির ছত্রও (১৫)-এর ছক) ত্রিভাগিক, কিন্তু বাংলা রূপান্তরের ক্ষেত্রে স্তবকের প্রথম ছত্র ত্রিভাগিক (এলাম / বসলাম / অপেক্ষায়), দ্বিতীয় ছত্র দ্বিভাগিক (অপেক্ষায় থাকা / অপেক্ষায়)। তাই গুনতিতে মূলে ও ইংরেজিতে ভাগগুলির মোট সংখ্যা যেখানে বারো, বাংলায় সেখানে দশ।

৪ ॥ মূলে এবং ইংরেজিতে পুনর্বত্তি-য়ুনিট ছিলো দুজাতের : এক জাত (আহু 'and sit', 'মিআ' 'I live') মাত্র দুবার করে পুনর্বৃত্তি হয়েছে লম্বমান রেখায়, অন্য জাতটি ('মাইনা' 'I come' ইত্যাদি) চারবার করে পুনর্বৃত্ত হয়েছে, এবং পুনর্বৃত্তি লম্বমান ও দিকশায়ী উভয় রেখা ধরেই হয়েছে। 'না'টিকে ধরলে এটিই একমাত্র লম্বমান রেখায় পুনর্বৃত্ত হয়ে একটি স্তম্ভের সৃষ্টি করেছে। ইংরেজিতে 'and' পর্বাংশটি, পূর্বেই দেখিয়েছি, এই জাতীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কিন্তু বাংলা রূপান্তরে পুনর্বৃত্তি-য়ুনিট হলো তিন জাতের : প্রথম জাতটি ('এলাম' 'মাইনা', 'বসলাম' 'আহু') মাত্র দুবার পুনর্বৃত্ত হয়েছে ; মূলে ও ইংরেজিতে এই জাতের য়ুনিট স্তবক-অভ্যন্তরে পুনর্বৃত্ত হয়েছে, কিন্তু বাংলায় স্তবকান্তরে পর্যাবৃত্ত হয়েছে। দ্বিতীয় জাতটি (মাত্র একটি য়ুনিট 'অপেক্ষায়' 'তাইনা' 'I wait') পাঁচবার পুনর্বৃত্ত হয়েছে—দিকশায়ী রেখা ধরে, আবার ছত্রান্তরে অর্থাৎ লম্বমান রেখা ধরেও (লক্ষ্য করবো, দিকশায়ী রেখায় হুবহু পুনর্বৃত্ত হয়নি—ছত্রের আদ্যংশে ('অপেক্ষায় থাকা' 'অপেক্ষায় তাও') বাড়তি শব্দের অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে) তৃতীয় জাতটি (মাত্র একটি য়ুনিট 'নিলাম ডেরা' 'মিআ' 'and live') মাত্র একবার উক্ত হয়েছে—অর্থাৎ এর পুনর্বৃত্তিই ঘটেনি। সব মিলিয়ে মূলে ও ইংরেজিতে যে-য়ুনিটগুলির মধ্যে একটা দ্বিভাজ্যতা[১৭] ছিলো, বাংলায় তার জায়গা নিয়েছে ত্রিভাজ্যতা।[১৮]

৫ ॥ দ্বিভাজ্যতা থেকে ত্রিভাজ্যতায় য়ুনিটগুলিকে আনার জন্যে দুটি ক্ষেত্রে পুনর্বৃত্তি-য়ুনিটে ('অপেক্ষায় থাকা', 'অপেক্ষায় তাও') অন্তর্ভুক্তি[১৯] বা নিহিতি-র[২০] ধর্ম দেখা দিয়েছে। 'আহু' ('and sit' 'বসলাম') য়ুনিটটি মূলে ও ইংরেজিতে দ্বিতীয় ছত্রে পুনর্বৃত্ত হয়েছে, কিন্তু বাংলা রূপান্তরে তৃতীয় ছত্রে পুনর্বৃত্ত হয়েছে—শুধু তাই নয়, স্তবকাভ্যন্তরে দ্বিতীয় ছত্রে 'অপেক্ষায় থাকা' এই য়ুনিটে থাকা শব্দটির দ্বারা 'বসলাম' য়ুনিটের দ্যোতনাটিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। 'বসলাম' ('আহু' 'and sit') য়ুনিটের পুনর্বৃত্তি বাংলা দ্বিতীয় ছত্রে ঘটেনি বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হলেও, 'অন্তর্ভুক্তি' বা 'নিহিতি'-র গুণটিকে মানলে বলতে হয় যে 'বসলাম' য়ুনিটের প্রচ্ছন্ন পুনর্বৃত্তি ঘটেছে থাকা শব্দটির মধ্য দিয়ে। দ্বিতীয় স্তবকে 'নিলাম ডেরা' ('মিআ' 'and live') এই ভাবে 'অপেক্ষায় তাও'-এর তাও-এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে নিহিত রয়েছে কিনা সে-বিষয়ে আমি খুব নিশ্চিত নই। যদি ধরে নিই

যে এখানে "নিহিত" ঘটেনি, তাহলে এটাকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। বলতে হবে যে এই শব্দটি একেবারে নতুন আমদানি—এটির ইঙ্গিতও মূল মেকিও কবিতাটিতে ছিলো না। কিন্তু ভাষান্তরে এটুকু স্বাধীনতা অনুবাদককে দিতে হবে।

৬॥ আর একটি ছোট্ট প্রসঙ্গের উল্লেখ করবো। সেটি হলো বাংলা রূপান্তরে লম্বমান রেখাধৃত পুনর্বৃত্তিদ্বারা কোনো রকম স্তম্ভসৃষ্টি সম্ভব হয়নি।

বাংলা রূপান্তরে তাহলে কিছু বাড়তি উপাদান এসেছে, মূলের কোনো কোনো উপাদানের অভাব ঘটেছে, আর কাব্যিক অন্তঃকলার ভিত্তিস্বরূপ মূলের পুনর্বৃত্তিকলাটিকে একটু পরিবর্তিত করে নেওয়া হয়েছে—এই তিনটি দিক মনে রাখলে মেকিও কবিতা ছয়টির যে ভাষান্তরমূর্তি নিচে উপস্থাপিত করছি, তার স্বরূপ ও তাৎপর্য বোঝা সহজতর হবে।

বাংলায় রূপান্তরিত মেকিও কবিতাবলী

এক : ডেরা

এলাম বসলাম অপেক্ষায়
অপেক্ষায় থাকা অপেক্ষায়।

এলাম বসলাম নিলাম ডেরা
অপেক্ষায় তাও অপেক্ষায়॥

দুই : রাঙাপাতা

ঘোরাই রাঙাপাতা নড়াই ফুরফুর
তাকিয়ে ছাখ রাঙা পাতার রং।

এই নে রাঙা পাতা, এবার আয়
এই নে সবজেটি, এবার আয়।
আমার পাতা তুই সবুজ বোঁটা তুই সবুজ বোঁটা।
আমার গেরি-রাঙা পাতার মুখ তুই পাতার মুখ॥

তিন : আইআ[২১]

আইআ হাঁটেন রাস্তায়
আইআ উদোম আইআ
হাঁটছেন তিনি হাঁটছেন।

খুঁজলে আমার হাতে দোষ কিছু পাবে না

আমার নিখুঁত হাতে দোষ কিছু পাবে না

আইআ নাচান বর্শা
আইআ উদোম আইনা
নাচান ঘোরান বর্শা।

আইআ করেন রণ প্রসাধন
আইআ উদোম আইআ
আইআ চড়ান যুদ্ধের সাজ গায়ে ॥

চার : কামতন্ত্র[২২]

এসেই পড়বো ঢুকে
কামিনী, তোমার বুকে।
'কাপোক' পাতার জাদুতে লটকে মজে
কাঁদুনে পাতার ঝাঁজে গুজরাবে সুখে ॥

পাঁচ : ঘুমপাড়ানি ছড়া[২৩]

গেছেন বাপ তোর
　　শিকার সন্ধানে—
　　　　ঘুমো রে, বাপধন, ঘুমো।
মা তোর ছুটেছেন
　　মাছের সন্ধানে—
　　　　ঘুমো রে, মা-মণি, ঘুমো ॥

ছয় : ঘুমপাড়ানি গান

"পোপেলেবা" পাহাড়চুড়োয়
দোলে আমার খোকা
দোলে আমার খুকু ॥

টীকা

[টীকাধৃত পারিভাষিক শব্দগুলিকে নক্ষত্রচিহ্নে ভূষিত করা হলো]

১ Stylistics অর্থে শৈলীশাস্ত্র* শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

২ পাপুয়া—নিউগিনির সেন্‌ট্রাল-ডিস্টিক্টের পশ্চিমাঞ্চলে Mekeo-দের বাস। এদের জাত্যভিমানপুষ্ট সংস্কৃতি গুরুত্বের দাবী রাখে।

৩ Oral অর্থে মুখবাহিত* শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

৪ Myth অর্থে অতিকথা* শব্দটির উদ্‌ভাবক রাজশেখর বসু।

৫ Memorization device—স্মরণকলা*।

৬-৭ Traditional—ইতিশ্রুত*, ইতিবাহিত*।

৮ Internal (Poetic / stylistic) device—অন্তঃকলা*।

৯ "লা" হ'লো মেকিও ভাষার একটি আশ্রিত বা অব্যয়বাচক শব্দ (bound morph, grammatical particle)।

১০ Repetative device—পুনর্বৃত্তিকলা*।

১১ Vertical—লম্বমান*।

১২ Horizontal—দিকশায়ী*।

১৩ Alternate (repetation)—পর্যাবৃত্ত*।

১৪ Galloping repetation—অশ্বাবৃত্তি*।

১৫ Stylistic !`evice—শৈলীকলা*।

১৬ মোটরগ্যারাজকর্মী কবিযশঃপ্রার্থী Allan Natachee নিজে মেকিও এবং স্বসংস্কৃতিরক্ষণে উৎসাহী। মুখবাহিত কবিতা ও লোকাখ্যান প্রচুর সংগ্রহ করেছেন ইনি। এঁর সংগৃহীত কিছু মুখবাহিত কবিতার সংকলন AIA নামে প্রকাশিত হয়েছে Papua Pocket Poets গ্রন্থমালার সপ্তম খণ্ড হিসেবে ১৯৬৮ সালে।

১৭ Binary—দ্বিভাজ্যতা*।

১৮ Trinary—ত্রিভাজ্যতা*।

১৯ Incorporation—অন্তর্ভুক্তি*।

২০ Embedding—নিহিতি*।

২১ 'আইআ' এক দেবপুরুষ বা কালচার-হিরো। মেকিও অতিকথামূলক আখ্যানাবলীতে আইআ চরিত্র খুবই মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ।

২২ 'কামতন্ত্র' নামধেয় রূপান্তরটি একজাতীয় জাদুজালছড়া বা magical spell। 'কাপোক' গাছের পাতা এই জাদুজালক্রিয়ায় ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে।

২৩ শিকারসন্ধান আর মাছের সন্ধান—এই দুটি বিপরীতধর্মী জীবিকা নিউগিনির সাধারণ সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে হবে। এখানে ছোটবড় জন্তুশিকার পুরুষের জীবিকাধর্ম, আর মাছ শিকার মেয়েদের জীবিকাকর্ম। নিউগিনির তটভূমির এলাকাগুলিতে মাছ শিকার জন্তু শিকার দুইই একরকম পুরুষের অধীনে, বাগানচাষ মেয়েদের অধীনে। মেকিওরা তটভূমির উপজাতি নয়, এরা ভূখণ্ডের অভ্যন্তরভাগের অধিবাসী তাই, বাগানচাষ ছাড়াও নদীতে মাছশিকারও মেকিও রমণীদের অধীনে।

সমালোচনা

কবিতার শত্রু ও মিত্র—বুদ্ধদেব বসু। এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ। কলিকাতা ১২। মূল্য পাঁচ টাকা।

"কবিতার শত্রু ও মিত্র" বইটি বাংলা সাহিত্যের একজন সার্থক কবির এবং গদ্যলেখকের শেষ রচনা-সংকলন—যেখানে তিনি মূলত ভাবিত হয়েছিলেন কবিতা বিষয়েই। কবিতা কী, কেন ; কবিতাকে কেমন করে তার এলাকা থেকে ভ্রষ্ট করার আয়োজন হয় ; শেষ অবধি কবিতা আমাদের কী দেয় —এসব আলোচনায় লেখক মসগুল হয়েছেন। এর সঙ্গেই রয়েছে একটি প্রবন্ধ 'কবিতা ও আমার জীবন'। এটি বুদ্ধদেব বসুর কবিতা আলোচনার জন্য একটি প্রয়োজনীয় দলিল। সে কারণেই এই গ্রন্থের প্রতিটি পংক্তি বিশেষ করে মনে পড়িয়ে দেয় সেই সতত সক্রিয়, অক্লান্ত ভাবুককে।

'কবিতার শত্রু ও মিত্র' প্রবন্ধটি এবং 'চরম চিকিৎসা' প্রহসনকল্প রচনাটি আকারে প্রকারে পৃথক হলেও দুটি লেখাই পরোক্ষে একই ভাবানুষঙ্গ বহন করছে। সেই সময়ে এই বাংলাদেশে প্রতিটি মুহূর্ত হয়ে উঠেছিল হননের রক্তে ক্লেদে সমাপ্লুত—দুই অর্থে 'হনন' কথাটি গ্রাহ্য, চরিত্রহনন ও ব্যক্তি-হনন। ওদিকে সেই সময়েই বাংলা সাহিত্যে "প্রজাপতি", "পাতক" এবং "রাতভোর বৃষ্টি" এক উত্তেজনা এবং আলোড়নের সৃষ্টি করে। সে উত্তেজনার জের আদালত অবধি গড়ায়। আদালতী রায় কোনোদিন সাহিত্য-সমালোচনায় নজির হিসাবে গৃহীত হবার সম্ভাবনা না থাকলেও অনেক সময় দেখা যায় যে, সংবেদনশীল লেখক সেই আদালতী অভিঘাত থেকে চিন্তার নতুন খোরাক খুঁজে পান। মনে করি না—কেউই করেন না—যে আদালত সাহিত্য বিচার করতে পারে। আদালত আইনভঙ্গ হয়েছে কিনা তার বিচার করে মাত্র, সাহিত্যগুণ-বিচার তার জুরিস্ডিকশনের বাইরে। অমুক বইটা রাজদ্রোহমূলক হয়েছে, এই আদালতী রায়ের ফলে একদা সেই বইয়ের বিক্রয়সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। সাহিত্য-বিচারের প্রশ্ন ঢাকা পড়েছে। তেমনি শিল্প সমাজের শান্তিভঙ্গ করছে কিনা আদালত এ বিচার যখন করে, তখন সে এক অসাহিত্যিক প্রশ্নের বিচার করে। আমাদের সঙ্গে এ প্রশ্নের কোনো প্রকার আবেগগত যোগ নেই। কিন্তু একজন চিন্তাশীল লেখক যে-কোনো বহির্জাগতিক ঘটনার আঘাতেই চিন্তার ক্ষেত্রে সক্রিয় হতে পারেন। সেইরকমই একটি নিদর্শন আলোচ্য বইয়ের কবিতার শত্রু-মিত্র-ভাবনা এবং আর একটি 'চরম চিকিৎসা'। হয়তো তাই 'কবিতার শত্রু ও মিত্র' প্রবন্ধে 'দেবীকে জিতিয়ে দিতে পেরেছিলাম', 'বিশাল বিতর্কময় সেই মামলা', 'আমি যাদের প্রধান ফরিয়াদী বলে উল্লেখ করেছি', 'কেননা আমরা জামিনে খালাশ আছি অন্তত'— ইত্যাকার উক্তিপুঞ্জ সেই জাগতিক ঘটনার দান বলেই মেনে নিতে হয়। লেখক যেভাবে এই প্রবন্ধে ফরিয়াদি-পক্ষ সাজিয়েছেন তা রীতিমতো কৌশলী সমাবেশ। আসামী যেক্ষেত্রে সুন্দরী দেবী, সেক্ষেত্রে ফরিয়াদি যত অকাট্য হয়, দেবীর অসহায়তাই তত জুরর মহোদয়গণকে দেবীর অনুকূল

করে তোলে—এই মামলা-বুদ্ধির চমৎকার প্রয়োগ ঘটেছে প্রথম প্রবন্ধটিতে। সব থেকে জোরালো ফরিয়াদ টলস্টয়ের—সেই ছিন্নমস্ত ঋষির। সব থেকে জোরালো আসামী পক্ষীয় সাক্ষী সক্রেটিস। সব মিলিয়ে প্রবন্ধটির উপভোগ্যতা সন্দেহাতীত। যদিও মনে করি, তর্কের মূল ভিত্তি একটু ধসে যায়, যখন আমাদের জানা থাকে যে, প্রাচীনতম অ্যারিস্টটল ও প্রাচীনতর অভিনবগুপ্ত কেউই নীতি দুর্নীতি ইত্যাদির সঙ্গে শিল্পসাহিত্যকে জড়িয়ে নেননি। এরকম ক্ষেত্রে মামলার মধ্যে না গিয়ে যেকোনো পক্ষকে নিজ নিজ আদালতে 'এক্স্ পার্টি' জিতে যেতে দেওয়াই ভাল। তা না হলে ব্যাপারটা হয়ে যায় দুই দেশের শান্তি আলোচনা—এ আলোচনায় সিদ্ধান্তে পৌঁছতে গেলে দুই পক্ষকেই কিছু কিছু ছাড়তে হয়। 'একান্তভাবে শিল্পকলার কাছে যা প্রাপণীয়, সেটা কী'?—এই প্রশ্নটা অবশ্যই প্রাসঙ্গিক। এর উত্তরে লেখক যখন বলেন: সভ্যতার একটি লক্ষ্য হলো সামঞ্জস্য স্থাপন, যখন বলেন: যা এই বহুবাঞ্ছিত অতিদুর্লভ সামঞ্জস্যরই প্রতিমূর্তি তা হল শিল্পকলা, তখন আমরা বুঝি যে, চুয়াল্লিশ পাতা ধরে সওয়াল জবাবের পর মামলাটিকে তাঁকে চিরকালের জন্য মুলতুবি রাখতে হচ্ছে। বিনিময়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে অন্য একটি সিদ্ধান্ত—'শিল্পকলা অবিকল ভাবে সুসমঞ্জস'। জীবনের জন্যই শিল্প—বুদ্ধদেব বসু অনুমোদিত এই পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত-তত্ত্ব এই সামঞ্জস্য-তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত। 'সামঞ্জস্য' কথাটি অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বের 'ঐক্য' তত্ত্ব থেকে খুব দূরে নয়। 'কেকাধ্বনি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেও মানসিক আনন্দ প্রসঙ্গে সামঞ্জস্য সংস্থাপনের কথা বলেছেন। তথাপি বুদ্ধদেব বসু বিষয়টিকে একটি নতুন মাত্রা দিয়েছেন। 'অপ্রয়োজনের আনন্দ' থেকে শিল্পলক্ষ্যকে সরিয়ে তিনি এই মাত্রার সাহায্যেই বলেন 'শিল্পকলা কোন্ বিশেষ অর্থে প্রয়োজনীয়'। 'শৃঙ্খলা—তা সংসারজীবনে কোথাও যদি নাও থাকে, তবু আছে ছন্দোবদ্ধ কোনো চরণে, কোনো সুগঠিত গদ্য বাক্যে, সুর অথবা রেখার কোনো বিন্যাসে—আছে এবং থাকতেই হবে'—এই হলো জীবনে সেই দেবীর ভূমিকা। এমন কথা এমন করে তিনি যখন বলেন, তখন মামলার কথা আর মনে থাকে না, ভুলে যাই অপঘাত-সমাকীর্ণ ক্ষণকালের ইতিহাস। মনে থাকে শুধু সেই অবিচল কবিতাপ্রেমিককে।[১]

'চরম চিকিৎসা' রচনাটিকে প্রহসন বলে গ্রহণ করলে উপভোগে কোনো বাধা থাকে না। কিন্তু যদি 'প্রবীণ লেখকের' ইশতেহারটিকে লেখক বুদ্ধদেব বসুর আত্মপক্ষসমর্থনের সমার্থক বলে দেখি, তা হলে একটা কথা বলার আছে। 'প্রবীণ লেখক' বলছেন, 'জগৎ ভরে কে না দেখেছে কুক্কুট, পারাবত ও চটক পক্ষীর তৃপ্তিহীন লাম্পট্যের দৃশ্য, জোনাকির যৌন আলোকবিন্দু, ময়ূরের

১ এই আলোচনার সঙ্গে সম্বন্ধ নেই, তবু বলি শ্রী বসুর একটি পত্রাংশে যখন দেখি, তিনি বলছেন, 'আমি আশীর্বাদ করি আমার দুই দৌহিত্র চাঁদে যাক, বা আন্দামানের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হোক,.বা হিমালয়ে আলুর ফসল ফলাক…কিন্তু কবিতার 'ক' অক্ষর কখনো যেন তারা না জানে' (কলকাতা/ বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা), তখন তার সঙ্গে খুঁজে পাই রুশোর আত্মজদের সম্বন্ধে কথিত এই উক্তির মিল—'বেছে নিতে পারলেও আমি তাদের লেখক অথবা কেরানি ক'রে তুলতাম না, আমি চাইতাম তারা লাঙল হাতে নিক, বা ছুতোর মিস্ত্রি হোক'। অথচ তিনি তো রুসোপক্ষীয় নন, তিনি তো দেবীপক্ষীয়। তিনি আজ অগুনতি বাঙালী কবির কাব্যস্রোতকে বৃক্ক থেকে নির্গত অনর্গল মূত্রের সঙ্গে তুলনা করলেন। এ যেন কতকটা সেই দেবতার আক্ষেপ—যিনি শিব গড়তে গিয়ে বাঁদর গড়ে ফেলেন। তাঁর অবস্থা তো তা ছিল না। যাকে তিনি অনিয়ন্ত্রিত অনর্গলতা বলছেন, তার মধ্যে যদি একটা—একটাও ঠিকমতো সনেট থেকে যায় তাহলে তাকে তো কোনো মহাকবিও বাদ দিতে বলতে পারেন না। কথাটা নিশ্চয় তাঁর পরিচিত।

যৌননৃত্য, কে না শুনেছে বসন্তকালে পুংস্কোকিলের কামাতুর চিৎকার? ফুল, যা বৃক্ষের যৌনাঙ্গ, এক অগুপ্ত উদ্ভিজ্জ উচ্ছ্বাস—তার মতো অশ্লীল আর কী আছে?' ঈসথেটিকস-এর সাবজেক্ট অবজেক্ট বিষয়-বিষয়ীর তর্ক এখানে বাদ দিলেও, একটা কথা না বলে পারি না। বিশ্বরচয়িতা লেখকের উদ্ধৃত ঐ সমস্ত ব্যাপারকে বিরাট বিশ্বকাব্যের পটে পরিবেশে এমনভাবে মিলিয়ে দিয়েছেন যে, তিনিও হয়েছেন এক 'নমস্ত শিল্পী', যিনি উদ্দেশ্যকে অতিক্রম করে গেছেন, উপকরণকে করেছেন আত্মসাৎ। তাই বিশ্বশিল্প সম্বন্ধে কখনো রসের ক্ষেত্রে অন্তত, অশ্লীলতার অভিযোগ ওঠে না—আদালতের কথা বলতে পারি না। আমাদের কি বিষয়টি এই ভাবেই দেখা উচিত? রুবেন্‌স বা বতিচেল্লি, কালিদাস বা খাজুরাহোর শিল্পী এভাবেই অতিক্রান্ত হয়েছেন উপকরণকে। আমাদের নিশ্চয় মনে আছে জয়দেবের সঙ্গে কালিদাসের তারতম্য নির্ণয়ে 'আবর্জিত কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং' অংশের রবীন্দ্রভাষ্য। নিশ্চয় জানি আমরা সেখান থেকেই, এবং আরো অনুরূপ নানাপ্রসঙ্গ থেকে, কেমন করে অংশ মিলে যায় সমগ্রে। আর সমগ্র? সে শ্লীলও নয়, অশ্লীলও নয়, সে শুধুই সমগ্র।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

মধুসূদন ও নবজাগৃতি—মোবাশ্বের আলী। মুক্তধারা। ঢাকা। মূল্য বারো টাকা।

রাজনৈতিক কারণে যখন বাংলা দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ল, তখন অনেকেরই মনে হয়েছিল, বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি বুঝি তার অনুসরণ করবে। এ ধারণা তখনকার দিনে যে-একেবারে অমূলক ছিল, তা হয়তো বলা যাবে না। কিন্তু স্বাধীনতা-পরবর্তী কয়েক বছরে অনেক ঘাত-প্রতিঘাত, তিক্ত-মধুর অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, অন্ততপক্ষে সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রায় অখণ্ডিত থেকে গেছি।

বস্তুত, একথা নতুন করে মনে পড়ল মোবাশ্বের আলীর "মধুসূদন ও নবজাগৃতি" পড়ে। নতুন ক'রে, কেননা আগেকার সেই শান্তিনিকেতনের সাহিত্যমেলা থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক নানা সাহিত্যসভার আয়োজনের দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও বলতে হয়, আমাদের পারস্পরিক সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্র এখনো সুপ্রসারিত নয়। সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে অত্যুৎসাহী স্বল্পসংখ্যক লেখক ও পাঠক ছাড়া সাধারণভাবে এখনো আমরা বহুলপরিমাণে এ বিষয়ে নীরব বা উদাসীন, কারণ যাই হোক। এমন অবস্থায় মোবাশ্বের আলীর বইটি যখন হাতে এল, এখন মনে হল—বাংলার পূর্বপ্রান্তে এমন কিছুসংখ্যক সাহিত্যের পাঠক ও লেখক রয়েছেন, যাঁরা নিরলস অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার সঙ্গে সব কিছু সংকীর্ণতার উপরে উঠে সাহিত্যচর্চায় ব্রত। সাতচল্লিশ-পরবর্তী আমাদের এখানে মধুসূদনচর্চার ক্ষেত্রে যেমন নানা দিগন্ত উন্মুক্ত হয়েছে, ওখানেও তেমনি নতুন নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে মধুসূদনের নবমূল্যায়নের চেষ্টা হয়েছে।

গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালে। বর্তমান সংস্করণটি শুধু কলেবরে নয়, অন্তদিক থেকেও নতুনই বলা চলে। প্রথম সংস্করণে ছিল দশটি অধ্যায়, বর্তমান সংস্করণে আরো ছ'টি অধ্যায়

সংযোজিত। অনুমান করা যায়, প্রথম প্রকাশের পর লেখক মধুসূদনকে আরো গভীরভাবে অনুধাবন করেছেন, তাঁর চিন্তার ক্ষেত্র আরো প্রসারিত হয়েছে। এই কারণে, দ্বিতীয় সংস্করণের সংযোজন শুধুমাত্র বাহ্যিক পরিপূরণ নয়, বলা যায়, গ্রন্থটির আলোচ্য বিষয় ও পরিকল্পনাকে ব্যাপকতা দিয়েছে।

বইটির নামকরণের দিকে লক্ষ্য রাখলেই লেখকের অম্বিষ্ট সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। উনিশ শতকের বাংলায় য়ুরোপীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্যের স্পর্শে যে নবজাগরণ ঘটেছিল, তারই যোগ্য প্রতিনিধি মধুসূদন এবং তার মূর্ত প্রকাশ তাঁর সাহিত্যে। মোবাশ্বের আলী এই ধারণার উপর ভিত্তি করে পর্যায়ক্রমে মধুসূদনের কবিপ্রতিভা, তাঁর ব্যক্তিমানস ও সর্বোপরি তাঁর কাব্যের মূল্যায়ন করেছেন। তার আগে তিনি নবজাগরণের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। যেন, লেখক চারদিক থেকে আলো ফেলে মধুসূদন ও তাঁর সাহিত্যকৃতিকে দেখতে চেয়েছেন। খণ্ডিত রূপে নয়, তাঁর গ্রন্থে মধুসূদনের একটি সার্বিক পরিচয় দেবার প্রয়াস স্পষ্ট। মধুসূদনের সমগ্র সত্তাকে তুলে ধরবার জন্য তিনি মূলত নির্ভর করেছেন মেঘনাদবধকাব্যের উপর। মোহিতলালও তাই করেছেন। এদিক থেকে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী যুক্তিহীন নয়, কিন্তু তবু, তিনি যদি মধুসূদনের সৃষ্টির অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিচরণ করতেন তাহলে তা তাঁর উদ্দেশ্যকে আরো সার্থক করতো। এটা ঠিক, উনিশ শতকের নবজাগরণ ও মেঘনাদবধকাব্য গভীর ভাবে সম্পৃক্ত। কিন্তু বীরাঙ্গনাকাব্যকেও কি অনুরূপ গুরুত্ব দেওয়া চলে না? অথবা মধুসূদনের অন্যান্য রচনায় গৌণভাবে কি নবজাগৃতির প্রভাব পড়েনি?

আমরা জানি, গোড়া থেকেই মধুসূদন-সমালোচনার তিনটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। এক, যাঁরা নিছক প্রশংসা করেছেন; দুই, যাঁরা নিছক নিন্দা করেছেন। তৃতীয় আর-একটি গোষ্ঠী—যাঁরা মধ্যপথ অবলম্বন করেছেন। এই গ্রন্থের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য লেখক সম্পূর্ণভাবে একটি বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। আবেগের বশে নয়, যুক্তিনিষ্ঠ বলেই 'মধুসূদনের অসংগতি'-র মতো একটি আলোচনা সম্ভব হয়েছে। অসঙ্গতির আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। বাস্তবিক পক্ষে একালের মধুসূদন-চর্চায় মোবাশ্বের আলীর "মধুসূদন ও নবজাগৃতি" উল্লেখযোগ্য সংযোজন, সন্দেহ নেই। লেখক সাম্প্রতিক সাহিত্যপাঠ ও সমালোচনার সূত্র অবলম্বনে মধুসূদনের মূল্যায়নে, মধুচর্চার ক্ষেত্র আরো প্রসারিত করেছেন।

প্রসঙ্গতঃ একটি বিষয় উল্লেখ করছি। মাঝে মাঝে যেসব উদ্‌ধৃতি দেওয়া হয়েছে সেগুলির যথোচিত সূত্র-সংকেত উল্লেখ করা প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া, তিনি আলোচনার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এমন কি ডস্টয়ভস্কি, হেমিংওয়ের উপন্যাসের প্রসঙ্গ তুলেছেন। এইসব প্রসঙ্গ উত্থাপনের সার্থকতা কোথায়? অথবা মধুসূদনের কবিচিত্ত বা কাব্যকৃতির সঙ্গে এর সার্থক যোগ কোথায়?

প্রণয়কুমার কুণ্ডু

Registered with the Registrar
of Newspaper for India under
R. N. No. 5480/57